বাঙালী বুদ্ধিজীবী মানস
ও
সমাজভাবনা

মিহির আচার্য

লেখক সমাবেশ

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ : সমাজ

প্রসঙ্গ : সাহিত্য

…বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা আমি পরিদর্শন করিয়াছি। আমি দেখিয়াছি নীল চাষের জমির নিকটবর্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান অন্যান্য অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উন্নততর। নীলকরদের দ্বারা হয়তো সামান্য কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়া থাকিতে পারে কিন্তু সরকারী কিংবা বেসরকারী যত ইউরোপীয় এখানে আছেন তাঁহাদের যে কোনো অংশের তুলনায় নীলকর সাহেবগণ এই দেশের সাধারণ মানুষের অকল্যাণের চাইতে কল্যাণই বেশি করিয়াছেন।

ভারতপথিক রামমোহন রায়

আমি দেখিয়াছি নীলের চাষ এই দেশের জনসাধারণের পক্ষে সবিশেষ ফলপ্রসূ হইয়াছে; জমিদারগণের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষক জনতার বৈষয়িক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। যে অঞ্চলে নীলের চাষ নাই সেই অঞ্চলের তুলনায় নীলচাষের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের মানুষ অধিকতর সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছে। আমি ইহা কেবল জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছি না, প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই আমি ইহা বলিতেছি।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Permanent Settlement-এর সঙ্গেই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে কৃষকেরাই যা কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে।…জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাংলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকা

কোনো মানুষই সমাজে থেকে সমাজের উর্ধ্বে বাস করতে পারে না। তার অর্থ প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণা স্বাভাবিক নিয়মেই ব্যক্তি তথা পারিবারিক মানুষকে নিয়ন্ত্রিত করে।

দীর্ঘকাল ঔপনিবেশিক শোষণ ও সামন্ততান্ত্রিক আয়তনের মধ্যে থেকে অজ্ঞাতসারেই শ্রেণীনির্বিশেষে সমস্ত স্তরেই আমাদের জীবনপ্রক্রিয়া ও দর্শনের জগতে সামাজিক বিন্যাসের ফলশ্রুতি দৃশ্যমান। কৌতূহলের বিষয় বিদেশী শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ছেঁড়া-খোঁড়া কিছু সংস্কারের উদ্যম দেখিয়েছেন বটে, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও সামন্ত-তান্ত্রিক ভূমিব্যবস্থার অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছায় উদাসীন সেজেছেন। বৃহত্তর জনসাধারণ রাষ্ট্রের নির্মম অত্যাচারে বহুবার উদ্বেল হয়ে ওঠা সত্ত্বেও সীমাবদ্ধ শক্তির কারণে অনিবার্যভাবেই তারা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কায়েমী স্বার্থচক্র ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের অজুহাতে নিয়মিত প্রচারবাদ্যের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে: এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, নিষ্ক্রিয়, পরিবর্তনবিমুখ, রাজনীতিপরাঙ্মুখ এবং অদৃষ্টবাদী। স্পষ্টত এই সনাতন দার্শনিক বক্তব্যকে কাব্যে ভাষা দেন রবীন্দ্রনাথ 'ওরা কাজ করে'-জাতীয় পদ্যে। এবং একেই ভারতীয় জনমানসের চরিত্র বলে প্রচার করবার চেষ্টা হয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীবিশেষের সুবিধা ও অধিকার উত্তরাধিকার সূত্রে অপরিবর্তনীয় রাখবার স্বার্থেই ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস, দর্শনে, এই মনোভঙ্গি গড়ে ওঠে।

একটা সরল প্রশ্নের সরল উত্তর পাওয়া অসম্ভব হবে না। প্রশ্ন এই: এদেশ কী কৃষিপ্রধান নয়? উত্তর: অবশ্যই হ্যাঁ। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক চিন্তাটাও এইভাবে আসে যে কৃষিব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে বা বিপক্ষের নিরিখেই একমাত্র প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ নির্ণীত হবে। ব্রিটিশ আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষের কল্যাণের জন্যে যে হয়নি এবং জমিদারি প্রথা যে প্রচণ্ডতম অন্যায়, এই সরল সত্য এদেশের আলোক-প্রাপ্ত মনীষীগণ বোঝেননি মনে করলে ওঁদের ধীশক্তির ওপর ভুল ধারণা করা হবে। আসলে এঁরা আইনসঙ্গত জমিদারি-নামক দস্যুতার অধিকার সম্পর্কে নিশ্চুপ। রামমোহন শোনা যায় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কিংবা স্পেনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের নিদারুণ সমর্থক ছিলেন। অথচ স্বদেশে চাষিদের

শোষণের পক্ষে নীলকর-অধিকৃত কৃষকদের তথাকথিত উন্নতমানের অবস্থায় গদ্‌গদ্‌ হয়ে উঠেছিলেন। রামমোহন ব্যক্তিগত জীবনে কী ভূমিস্বার্থকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিলেন? কিছু কিছু প্রগতিশীলের নিকট অধুনাপূজিত 'মানবতাবাদী' 'বিশ্বপ্রাণ' রবীন্দ্রনাথ 'দু বিঘা জমি'—পদ্যে জমিদারী শোষণের নির্মম চিত্র আঁকলেও বিবেকের তাড়নায় তিনি কী জমিদারী ত্যাগ করেছিলেন? পর্যন্ত মার্কসবাদী জীবনীকারদের রচনায় খাজনা-আদায়কারী রবীন্দ্রনাথের মহানুভবতার সুবিধেবাদী রসালো গল্প শুনতে পাওয়া যায়!

এখানে অনেকেই সাফাই গাইবার সুরে বলবেন ব্যক্তি ও শিল্পিসত্তার মধ্যে এই আপাতবিরোধ একটি সাধারণ নিয়ম। অবশ্যই এটাকে নিয়ম বলে মেনে নিতে পারলে অনেক গুরুতর জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। জমিদারী চাষিদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে টলস্টয় নিয়মবহির্ভূত ব্যতিক্রম সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন!

আমরা এবার আমাদের অভীষ্ট স্থানে আসতে চাই। সেটা এই: কী-ব্যক্তিগত কী-সমাজগত কী-রাষ্ট্রগত পরিকল্পনায় এই দ্বৈধ সত্তাকেই আমরা নিয়ম করে ফেলেছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: কথায় ও কাজে আত্মীয়তার বন্ধন নেই। যার তাৎপর্য শাদা বাঙলায় প্রচ্ছন্ন ভণ্ডামি। তাই এদেশে রাষ্ট্রচিন্তা সমাজচিন্তা ধর্মচিন্তা, সাহিত্য-শিল্প-শিক্ষায় চলেছে গোঁজামিলন, জোড়াতালি এবং পরিমাণে অনিবার্যত আমরা ধাবিত হচ্ছি সর্বনাশা অতল অন্ধকার গহ্বরে।

ধর্মীয় সংঘ ও ধর্মগুরুর সংখ্যা বিচারে এদেশকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম আধ্যাত্মিক দেশ বলে স্বীকার করতেই হয়। স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত এটা ভালো করে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রাজনীতিকে তিনি ধর্মের প্রচ্ছদপট পরিয়ে ব্যবহার করে বহুলাংশে সার্থকও হয়েছিলেন। এই শ্রেষ্ঠতম অধ্যাত্ম সাধনার দেশ আমাদের ভারতবর্ষ দেখতে দেখতে কী করে নিকৃষ্টতম নরকে পরিণত হল, সেটা ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় হওয়ার যোগ্য। খাদ্যে, ওষুধে বেবিফুডে, ধর্মে রাষ্ট্রে, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে এমন শয়তানের কারখানায় কেমন করে উন্নীত হল, সেটাই চিন্তা করা প্রয়োজন। সামান্য উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় গান্ধীজির মাদকদ্রব্য বর্জনের সাধু সিদ্ধান্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে সরকার পৃষ্ঠপোষণায় কী-বিপরীত রূপ ধারণ করেছে কল্পনা করুন। আরো কল্পনা করুন পৃথিবীর 'বৃহত্তম গণতন্ত্রে' সরকার বিরোধী মানুষকে শাসন করবার জেদে প্রচলিত আইনকানুন যথেষ্ট নয়, বিনাবিচারে বিনাপরোয়ানায় বছরের

পর বছর ধরে তাঁদের আটকে রাখা তো চলেই, এমনকি অজুহাত তুলে জেলের মধ্যে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অনাবশ্যক জরুরি অবস্থা বজায় রাখতে হয়। অথচ খাদ্যে-ওষুধে-বেবিফুডে চোরাকারবারী ভেজালকারীদের জঘন্যতম অপরাধেও নাকি উপযুক্ত আইন তৈরি করা যায় না!

বুদ্ধদেব-চৈতন্য-নানক-মহাবীর-গান্ধীর পাশাপাশি চিত্রটা কীভাবে আপনি মেলাবেন?

এই সমাজসংগঠনের চেহারাটা বস্তুত লাস্কির ভাষায় এই রকম 'a combination of privilege and gangsterism. একদিকে উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত সামাজিক সুবিধে ও অধিকারের নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহার, অন্যদিকে এই অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখতে জনসাধারণের মধ্যে থেকে বেছে নেয়া অনুগৃহীত কিছু ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী সৃষ্টি, যাদের একমাত্র কাজ শোষিত জনতার রোষ থেকে মুষ্টিমেয় অধিকারভোজীদের রক্ষা করা।

উপরিতলার এই সুবিধাখোর শ্রেণী একটা মাত্র মানসিক ব্যাধিতে ভুগছে। তা হচ্ছে ভয়। নিজেদের সুখসুবিধে হরণের দুশ্চিন্তা। শোষিত জনতার সচেতনতা, বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, বিপ্লব এবং সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার অদূর সম্ভাবনা। এবং এই সম্ভাবনাকে যতদূর সম্ভব ঠেকিয়ে রাখবার গরজে সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে চৌকিদারের ভূমিকায় নিযুক্ত করা। এই সংস্কৃতির নাম 'new commercial youth culture' বা নয়া বাণিজ্যিক যুব সংস্কৃতি। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পণ্যের মতো সারা ধনবাদী রাষ্ট্রে মড়কের আকার নিয়েছে। তার লক্ষণ আঁটোসাঁটো প্যাণ্ট, বেল্‌বটম্‌, সাইকেডেলিক শার্ট, ঝাঁকড়া বাবরি চুল, লম্বা জুলপি, জলদস্যু-সুলভ গোঁফ বিন্যাস, অভূতপূর্ব প্রগলভ পোশাক, মাদক বড়ি ইত্যাদি? চিন্তার বিষয়: এই অর্বাচীন দৃষ্টিমার্গ ও রুচি দিনের পর দিন সাবালক বয়স্কজীবনেও অনুপ্রবেশ করছে! একটি মাত্রই উদ্দেশ্য: মানুষের সংগ্রামী চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা। আনন্দের বিকারকে জাগিয়ে তুলে প্রচলিত রাষ্ট্রযন্ত্রকে টিকিয়ে-রাখা।

সঠিক রোগনির্ণয় না হলে দামি ওষুধ প্রয়োগ যেমন ব্যর্থ হতে বাধ্য তেমনি এদেশে সত্যিকার যাঁরা মঙ্গল করতে চান তাঁদের এই জটিল সমাজ-পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে হবে। আসল সমস্যাকে এড়িয়ে আর কিছু করবার চেষ্টা সময়-কাটানোর একটা শ্রেষ্ঠ উপায় ছাড়া কিছু হবে না।

ব্রিটিশ শাসনের ভূমিকা

.........Thus it came about that the East India Company, formed in 1600, was much more than a trading company. Before the end of the seventeenth century it was given power. by an Act of the British Parliament, to send out ships of war, men, and ammunition for the security of its factories and places of trade, and to make war upon "any people that are not Christians (sic) in any places of their trade, as shall be for the most advantage and benefit of the said Governor and Company and of their trade." Gradually during this century the Company extended its territory, so that the monies it raised by the taxation of the native populations became a much more fruitful source of income than its trading profits. In a resolution adopted in 1688 the Company pointed out that "revenue" raised by taxation was certain "when twenty accidents may interrupt our trade." The Indian Crisis : Fenner Brookway.

এটি বিস্ময়ের কথা হলেও স্বীকার করতে হবে যে, ইংরাজ আমলে এবং ইংরাজের শাসকের ভূমিকা থেকে বিদায় নেবার পরও, আজ পর্যন্ত, এদেশে এমন মানুষের অভাব নেই যাঁরা বৃটিশ শাসনের সোনালী দিনগুলির জন্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন! বিদেশী প্রভুর এই অপূর্ব মাহাত্ম্য যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সওদাগরি রূপে এদেশের মাটিতে প্রথম প্রকটিত হল সেই দিন থেকে তার অন্ধ ভক্তজনকে রথের তলায় গড়াগড়ি দিতে দেখা গেল। ভারতপথিক রামমোহনই মূলত কোম্পানির হোমরা চোমরা সাহেব স্ববোদের 'ব্যক্তিগত' রোজগার কিংবা বিলাসব্যসনের প্রয়োজনে চড়া সুদে টাকা ধার দিয়ে কুসীদজীবীর ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এবং কোম্পানির কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এই আর্থিক সহবাসের ফলে রামমোহন ১৮১৪-১৬ সাল থেকে বিরাট

বিরাট বাড়ি কিনে কলকাতায় স্থায়ী হয়ে বসে তৎকালীন বাঙালী 'ভদ্দরলোকদের' মধ্যমণি হয়ে উঠলেন। ইংরাজদের অনুকরণে রামমোহনও সভা সমিতি গড়ে তুললেন। বড় বড় মজলিসে সাহেব সুবোদের খানাপিনা, 'নিকি' বাইজির নাচে তিনি দেদার টাকা খরচ করতে লাগলেন। অন্যদিকে চলল ধর্ম সংস্কার, সমাজ-সংস্কারের কার্যাবলী। অবশ্য মনে রাখতে হবে এই সকল সংস্কারমূলক কার্যাবলীতে সরকারের অনুমোদন ছিল। যেহেতু এই সকল 'সাধু' কাজে ইংরাজের ঔপনিবেশিক শোষণের স্বার্থে আঘাত পড়েনি।

'নেটিভদের' মধ্যে তৎকালীন ভারতবর্ষে রামমোহনের মতো ধনী ব্যক্তির সহযোগিতা ইংরাজদের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হল। কারণ রামমোহন ভবিষ্যতের জন্যে ভারতের যে-পথ উন্মুক্ত করে দিলেন সেই পথের চিহ্ন ধরে আগামী কালের শাসকশ্রেণীর মজবুত 'ইতিহাস' তৈরি হল, যার সঙ্গে স্বভাবতই বৃহত্তর জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

বলা বাহুল্য, রামমোহন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-পুষ্ট 'নব্য জমিদার শ্রেণী', মধ্যস্বত্বভোগী এবং তারি আশ্রয়ে লালিত 'মধ্য শ্রেণী' গড়ে উঠল, যাঁরা দীর্ঘকাল, এবং আজো পর্যন্ত শ্রেণী-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তাবৎ ভারতবর্ষের মানুষের স্বনির্বাচিত মুখপাত্র! এই 'মধ্য শ্রেণীই' ইংরাজ আমল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁদেরি স্বার্থে তৈরি ইতিহাসের শবাধারটিকে ভারতবর্ষের বৃহত্তর মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন।

গ্রামে গাঁথা কৃষি ও কুটির শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মূলত কৃষক মানুষ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের বাইরে কেবল যুগে যুগে শোষণের জোয়ালটাকে এক কাঁধ থেকে আরেক কাঁধে ফেলেছে, দুর্ভিক্ষ মহামারী মৃত্যুর শিকার হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে, মার খেয়েছে। এ ব্যাপারে ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য মধ্য শ্রেণী ও শাসক শক্তির স্বার্থ মিলেমিশে তাদের চোখে এক হয়ে গেছে। মধ্য শ্রেণীর নেতৃত্ব ইংরাজের কাছ থেকে আরো অধিক শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধে দাবি করেছে, অথচ ঘৃণাক্ষরে বিংশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত এদের রাজনৈতিক পার্টি ঘৃণ্য জমিদার ব্যবস্থা উচ্ছেদের সামান্য প্রস্তাবও নিতে সক্ষম হয়নি।

বৃহত্তর মানুষের হাতে মধ্য শ্রেণীর এই 'ইতিহাসের' পতাকাটা ধরিয়ে দিয়ে এই সরণিতেই আমাদের মধ্য শ্রেণী অধ্যুষিত ঐতিহাসিকগণ আজো

পর্যন্ত ইতিহাসচর্চা করে চলেছেন। ফলে সত্যিকার জনগণাশ্রিত ইতিহাস আজো লেখা হল না। অবশ্য এর জন্য আমরা দুঃখ করিনা, কারণ শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ইতিহাস সর্বদাই শাসকশ্রেণীর ইতিহাস।

এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উনিশ শতকের ক্রমাগত কৃষক অভ্যুত্থান, সিপাহী যুদ্ধের মতো জনগণের 'ব্যাপক জাগরণ', কোনো কিছুই মধ্য শ্রেণীর কাছে আমল পায়নি। যেহেতু এই আন্দোলনগুলো সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে একযোগে আঘাত হানে। এর চেয়ে বরং ধর্ম ও সামাজিক নেতা সেজে সংস্কার পন্থী ঝোঁকগুলোকে কাজে লাগানো নিরাপদ। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে ইংরিজি-মাধ্যম সহ চালিয়ে দেয়াই ভালো।

কৌতুকের বিষয়, এই ইংরাজ-সহযোগী নেতৃবর্গ যখন ধর্ম-সমাজ-শিক্ষায় রেনেশাঁসের খোয়াব দেখছেন অন্য দিকে কৃষক বিক্ষোভ চলাকালীন রাম-মোহন সেখানেই তালুক কিনছেন, ইংরাজ সিভিলিয়ানদের সুদে টাকা দিচ্ছেন, বাবা রামকান্ত রায় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা জগমোহন বাকি খাজনার দায়ে জেলে বন্দী থাকলেও বিত্তবান পুত্র টাকা দিয়ে তাঁদের মুক্ত করছেন না। রামকান্তের মৃত্যু হল। রামমোহন নানা কারণে পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত থাকতে পারলেন না বন্দী জগমোহনের কাতর প্রার্থনায় সুদ সমেত ফেরত পাবার কড়ারে রামমোহন তাঁকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন। জগমোহন মেদিনীপুর জেল থেকে মুক্তি পান।

বিষয় আশয়ের প্রতি এই আসক্তি রামমোহনের ধর্মচর্চায় যে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করেনি তার কারণ সম্ভবত রামমোহন 'ধার্মিক' ছিলেন না, ধর্মান্দোলনকে তিনি সমাজ সংস্কারের অন্যতম বাহন মনে করতেন।

যেমন করতেন তাঁরি মন্ত্রশিষ্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর বিষয়বুদ্ধি ভ্রাতৃবধূ ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে উৎসাহিত করে। তাঁরি পাবনার জমিদারি থেকে বে-আইনি করের অত্যাচারে যখন কৃষকেরা বিদ্রোহ করেন তখন দেবেন্দ্রনাথের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোশিয়েশন জমিদারি স্বার্থ রক্ষার অজুহাতে কৃষক বিক্ষোভকে "মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা" বলে অপব্যাখ্যার আশ্রয় নেন।

দৃষ্টান্ত না বাড়িয়েও স্বীকার করা ভালো এই হচ্ছে নব্য মধ্য শ্রেণীর চরিত্র। যার সঙ্গে বৃহত্তর দেশের মানুষের স্বার্থের কোনো যোগ নেই। এই শ্রেণীই প্রথমাবধি এদেশে ইংরাজ শাসনের মস্ত সমর্থক। এবং স্বীকার করে

নেয়াই ভালো উনিশশতকে বিশেষ করে বাঙালী মধ্যশ্রেণীই এই কৃতিত্বের অংশীদার। গান্ধীজি রাজনীতিতে প্রবেশ করবার আগে এই বাঙালী ভদ্দর লোকেদের রাজনীতিই সর্বভারতীয় 'মধ্য শ্রেণীর' রাজনীতির আকার ধারণ করেছিল।

ইংরাজ প্রভুত্ব আর এদেশে নেই, কাজেই নিরাবেগ ভাবে তাদের শাসন-কালের একটা জমাখরচ নেয়া যেতে পারে। বৃটিশ সমর্থকদের যুক্তিগুলি এই জাতীয়:

ক) এঁরাই প্রথম ভারতব্যাপী সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা স্থাপন করলেন

খ) রাজস্ব আদায়ের একটি আইনমাফিক ব্যবস্থা করা হল

গ) দেশরক্ষার ভার নিলেন তাঁরা।

প্রশ্ন হচ্ছে: কার স্বার্থে? এর দ্বারা দেশের ব্যাপক জনসাধারণের জীবনযাত্রার কোনো মানোন্নয়ন হয়েছিল কি?

ভারতবর্ষের মানুষের পিঠে করের বোঝা চাপিয়ে যে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে তার $\frac{১}{৩}$ ভাগ ব্রিটিশ ও ভারতীয় সিপাহীদের হাতি পোষার খরচে গেছে, $\frac{১}{৩}$ ভাগ গেছে সিভিল সারভেন্টদের উদরে, যাদের বেশির ভাগ ছিল ব্রিটিশ-পুঙ্গব। $১\frac{১}{৪}$ শিক্ষাখাতে, $\frac{১}{২৮}$ স্বাস্থ্য রক্ষায়, $\frac{১}{২0}$ কৃষিকাজে এবং অন্যান্য গৌণ বিষয়ে।

ব্রিটিশ-শক্তির ভারতবর্ষে কোন্ স্বার্থ রক্ষার কাজ চলেছিল? ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থেই অন্যান্য বেনেদের মতো এদেশে ইংরাজদের পদার্পণ। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জিনিস কেনা বেচা ছাড়াও তাদের রোজগার বাড়াতে পেরেছিল ভারতীয় রাজন্যদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এবং জনসাধারণের কাছ থেকে করের মারফত। কোম্পানির সমুদয় রোজগার সরকারকে অর্পণ করা হয়।

পরবর্তী কালে এল ইংরাজ পুঁজির লগ্নি এবং ইংরাজ শাসকবর্গকে মাইনে দেবার ব্যবস্থা।

ফলত, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ তিন ধরনের স্বার্থরক্ষা করার ঢালাও সুযোগ পেল।

১. পুঁজি লগ্নি করবার ক্ষেত্র

২. ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসের বাজার

৩. শাসকবর্গকে মাইনে দেবার জন্য রোজগারের পথ

১৯২৭-২৮ সালে ইংল্যাণ্ডে তৈরি জিনিসের আমদানি এবং ভারতবর্ষের জিনিসের রপ্তানির গড় হচ্ছে যথাক্রমে ৯০,০০০,০০০ পাউণ্ড এবং ৬৭,০০০,০০০ পাউণ্ড।

ব্রিটিশ দ্রব্যের এদেশের বাজার দখল করার হিসেব অবশ্যই প্রভুদের অনুকূলেই যায়।

দ্বিতীয়ত, শাসকবর্গের খরচ জোগাতে ভারতবর্ষের রাজস্বের ১/৩ অংশ শুষে নেয়া হয়। তার পরিমাণ মোটামুটি বার্ষিক ৩২,৮০০,০০০ পাউণ্ড।

বেতনের চেহারাটা একবার লক্ষ্য করা যাক :

ভাইসরয় এবং গভর্নর জেনারেল	১৯,০০০ পাউণ্ড
সেনাবাহিনীর প্রধান	৭,৪০০ "
গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের সভ্য	৬,০০০ "
দশটি প্রাদেশিক গভর্নর	৪,৯০০ থেকে ৯,০০০ "
প্রধান বিচারপতি (কলিকাতা)	৫,৩০০ "

এই শাসকবর্গের খরচ জোগাতে বেতন হিসেবেই ভারতবর্ষ থেকে গেছে বছরে ১,২২০,০০০ পাউণ্ড।

এছাড়াও রয়েছে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের জন্যে খরচ ৩৬৫,৮০০ পাউণ্ড, তার মধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট দিত ১৩৬,০০০ পাউণ্ড, বাকিটা ভারতবর্ষ থেকে যেত।

সেনাবাহিনীর মোট খরচ বছরে ৪৩,৭৬১,০০০ পাউণ্ড। স্মরণ রাখা উচিত যে সেনাবাহিনীর ১/৩ অংশ ব্রিটিশ। ব্রিটিশ সৈন্য ভারতীয় সৈন্যের অপেক্ষা চারগুণ বেশি পেত। ব্রিটিশ সেনা অফিসার ভারতীয় অফিসার থেকে ছয়গুণ বেশি।

কেউ কেউ মনে করতে পারেন কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ভারত শাসনের ভার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ওপর এলে অবস্থার উন্নতি হয়েছে!

কিন্তু লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড অকল্যাণ্ড, লর্ড এলেনবরো, লর্ড ডালহৌসির আমলে শাসনযন্ত্রের যে চেহারা প্রত্যক্ষ করা গেছে তা কোম্পানির শাসনের থেকেও জঘন্য।

কোম্পানির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকার শুরু করল আফগানি যুদ্ধ। পরিণামে আফগানদের আক্রমণে, ঠাণ্ডায়, ক্ষুধায় ১৬,০০০ সৈন্য ধ্বংস হল। মিত্র

রাজ্য সিন্ধু জয়ও ষড়যন্ত্রমূলক। পাঞ্জাব অধিকারও এই জাতীয় ঘটনা। বার্মা অধিকার করা হল যেহেতু ইংরাজ বণিকদের ওপর কর ধার্য করা হয়েছিল।

সবচেয়ে নিন্দার্হ কাজ উত্তরাধিকারের অভাবে রাজন্যবর্গের দত্তক নেবার অধিকারকে কেড়ে নিয়ে সেসব রাজ্য দখল করা। সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর এবং আরো ছোট খাটো রাজ্য এইভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসে আহুতি দিল।

নানাভাবে আদায়ীকৃত ভারতের এই রাজস্ব ব্রিটিশ কোথায় কোথায় নিযুক্ত করল? তার পরিচয় আগেই দেয়া হয়েছে। মজার ব্যাপার ভারতবর্ষের বাইরে ব্রিটিশের যুদ্ধ অভিযানের খরচও এই হতভাগ্য দেশকে বহন করতে হয়েছে। যেমন ইজিপ্ট-আবিসিনিয়া, আফগানিস্তান ও বার্মার যুদ্ধ। এই-ভাবে ভারতের রাজস্বের ⅓ অংশ সেনাবাহিনীর পেছনে ব্যয় হয়েছে।

হাসান ইমাম ১৯১৮-তে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে যে তীব্র মন্তব্য করেন ইতিহাসের প্রয়োজনে তার উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার টানছি।

"The apologists of British Rule in India have asserted that the presence of the British in this land has been due to humane motives; that the British object has been to save the Indian peoples from themselvs; to raise their moral standard, to bring them material prosperity, to confer on them the civlising influences of Europe, and so forth and so on. The fact is that the East India Company was not conceived for the benefit of India, but to take away her wealth for the benefit of Britain. The greed of wealth that characterised its doings was accompanied by greed for territorial possession, and when the transference of rule from the company to the crown took place, the greed of wealth and the lust of power abated not one jolt in the inheritors, the only difference being that tyranny became systematised and plunder scientific."

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ইংরাজি শিক্ষা

শ্রেণী বিভক্ত সমাজে রাষ্ট্র এক শ্রেণী দ্বারা আরেক শ্রেণীকে দাবিয়ে-রাখার যন্ত্র বিশেষ। শাসকশ্রেণী শুধুমাত্র শাসন পদ্ধতি তৈরি করে নিশ্চিন্ত থাকে না। এ-শাসকগোষ্ঠী যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ হয় তাহলে তার রাজত্বকে দৃঢ়মূল করতে উপনিবেশেও স্থানীয় লোকেদের মধ্যে তাকে সমর্থক ও সহযোগী খুঁজতে হয়। যারা আদি থেকেই সাম্রাজ্যবাদ প্রসাদপুষ্ট সুবিধেভোগী হয়ে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সাম্রাজ্যবাদের চিত্তগুণের পঞ্চমুখ প্রশংসা জুড়ে দেবে।

এই সহযোগী শ্রেণী যত পুষ্ট হবে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের মস্ত সহায়ক হবে। কালক্রমে স্থানীয় সহযোগীদের মূল্যবান সৌহার্দ্যেই সাম্রাজ্যবাদকে নিজের দেশ থেকে লোক এনে শাসন চালনার বাড়তি ধকল সইতে হবে না।

এই উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তাদার বা মুনশীকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করবার কালে তার সঙ্গেই জমিদারি সূত্রে গাঁটছড়া বাঁধা হল। জমি রাজস্বের আয়ই এদেশে ব্রিটিশের প্রথম পুঁজি, ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন। এই লণ্ঠনের চিরস্থায়ী ঠিকে নিল জমিদার শ্রেণী। সাম্রাজ্যবাদ রক্ষার একটি জবরদস্ত ঘাঁটি হল জমিদার, যারা জমিদারি শেকলের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের শেকলকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে নিল। দুটি স্বার্থ একই সূত্রে জড়িত হওয়ায় বিচ্ছিন্নভাবে কোনোটিরও বিচার করা সম্ভব নয়।

ব্রিটিশের দ্বিতীয় কাজ হল, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে এদেশে একটি শক্তিশালী আমলাতন্ত্র তৈরি করা, যারা কেরিয়ার তৈরির যূপ-কাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত এবং দেশের মৃত্তিকার সঙ্গে সম্পর্কবিহীন, জনবিরোধী, অন্ধ, নিষ্ঠুর যন্ত্র বিশেষ।

তৃতীয় কাজ হল, শাসক গোষ্ঠীর ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সম্ভব হলে ধর্মে, কালা চামড়ার 'ইংরাজ' তৈরি করা। যারা জমিদার নয়, তথাকথিত 'মধ্য শ্রেণী'।

কাজেই এটা একটা পরম সত্য যে, ধর্ম, ভাষা, শিক্ষা, আচার আচরণ, সংস্কৃতির 'স্বাধীন' কোনো অস্তিত্ব নেই। তা শাসকশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষারই বিভিন্ন দপ্তর।

সাম্রাজ্যবাদকে মজবুত করবার অভিপ্রায়ে এসব কাজে হাত দিতে ব্রিটিশের বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। সেরেস্তাদার-মুনশী জমিদার চক্রের প্রভুভক্তি জন্মকাল থেকেই, বিশেষ করে বাঙালী সুবিধেভোগী শ্রেণীর মধ্যে, অপূর্ব সাম্রাজ্যবাদ প্রীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। বস্তুত কোনো ঔপনিবেশিক গোলামই এমন করে বিদেশী প্রভুকে এই ধরনের ভালোবাসেনি।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যখন এদেশে ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে ইংরাজি শিক্ষা-ব্যবস্থা চালু করবার প্রয়োজন দেখা দিল তখন রামমোহন রায় বিদেশী শিক্ষার প্রচণ্ড উৎসাহী হয়ে এগিয়ে এলেন। উল্লেখযোগ্য, এই রামমোহনই মুসলমান আমলে তৎকালীন সরকারি ভাষা ফার্সী শিখেছিলেন।

শাসকগোষ্ঠীর বদলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও ইংরাজি ভাষার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

মেকলে সেদিন যে আশা পোষণ করেছিলেন ভারতীয়ের মধ্যে কালা-চামড়ার সাহেব তৈরি করবার, যাঁরা আচারে-আচরণে ইংরিজিয়ানায় বুঁদ হয়ে ক্রমে নীচু তলার মানুষকে প্রভাবিত করতে পারবেন। এটাই মেকলের infiiltration theory. কাজেই ইংরাজি শিক্ষার প্রয়াস সীমাবদ্ধ রইল উচ্চশিক্ষার মধ্যে, পল্লী অঞ্চল থেকে দূরে কতিপয় শহরে মধ্য শ্রেণীর চৌহদ্দিতে। প্রাথমিক শিক্ষার দিকে ব্রিটিশের তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। কারণ 'ছোটলোকদের' মধ্যে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঝুঁকি অনেক। এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবে শহুরে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী, তাদেরি শ্রেণীস্বার্থকে নিরাপদ করবার প্রয়োজনে।

ইংরাজি শিক্ষার পাথরটা ইংলণ্ডের ছাঁচে হুবহু আমাদের সমাজদেহে বসিয়ে দেয়া হল। বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ-ইস্কুলের মজবুত অট্টালিকা গড়ে উঠল। আনুষঙ্গিক দামি সরঞ্জাম পৌঁছে গেল। শিক্ষার মাধ্যম বিদেশীভাষা নির্দিষ্ট হল, পাঠ্যসূচী, পঠন পাঠনের কৌশল ইত্যাদির সমাবেশে এক রাজসূয় যজ্ঞ শুরু হয়ে গেল।

এদেশে ইংরাজি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগানে যাঁরা পঞ্চমুখ তাঁদের কাছে সবিনয়ে একটি প্রশ্নই রাখতে চাই, এই শিক্ষার কী ফলশ্রুতি আমাদের ওপর বর্তেছে? একটা কাজের ভালোমন্দ বিচার হবে তার ফলের ওপর। আমাদের তো মনে হয় সাম্রাজ্যবাদ যে-উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরাজি চাপিয়ে

দিয়েছিল তার সে-উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। অর্থাৎ বৃহত্তর দেশের মানুষের সম্পর্ক রহিত শহুরে শিক্ষিত (?) মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব, যাদের হাতে নিশ্চিন্তে একদা ক্ষমতা হস্তান্তর করা যাবে। ইংরাজি শিক্ষা সার্থক ভাবে আমাদের নিজস্ব অবস্থান, পরিবেশ, প্রয়োজনকে ভুলিয়ে দিয়ে ধার-করা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গিকে আলগাভাবে চাপিয়ে দিল। আমাদের দেশজ যা কিছু মূল্যবান উত্তরাধিকার ছিল সবকিছু নস্যাৎ করতে শিখে আমরা সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহ্যকেই বড় করে দেখলাম। এবং একজন নিষ্ঠাবান 'ভারতীয় প্রজা' হিসাবে এ দেশের সমস্যাকে বুঝতে ও সমাধান করতে প্রয়াসী হলাম। আমরা এমকল ধারণা পোষণ করলাম যে, ইংরাজ আমাদের 'জাতীয়তা-বোধ' 'দেশপ্রেম' ইত্যাদি সম্পর্কে প্রথম শিক্ষিত করল। এবং এই ধারণায় বুঁদ হয়ে দেশের আসল চেহারা—বিভিন্ন জাতি-উপজাতি, বর্ণ, সম্প্রদায়, শ্রেণীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে ধামাচাপা দিয়ে সদ্যোজাগ্রত মধ্যশ্রেণীর শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হবার স্বপ্ন দেখতে শিখলাম।

আমাদের 'জাতীয়তাবোধের' একটি চমৎকৃত দৃষ্টান্ত এই : সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ১৮৫৭-এর মূলত কৃষক-সংশ্লিষ্ট প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' বলে কলংকিত করলামই শুধু নয়, বাঙালী বুদ্ধিজীবী তার তাৎপর্যকে অস্বীকার করে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধাচরণ করল। 'ভারতবর্ষের ইতিহাসে' আমাদের ছাত্রেরা আজো পর্যন্ত ঘটনাটিকে সিপাহী বিদ্রোহ বলে মুখস্থ করছে। এই ইতিহাসই সিরাজদৌল্লাকে নৃশংস সাজিয়েছে, প্রতাপ রায়কে নির্মম বানিয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে কল্যাণকর এঁকেছে, ক্যানিংকে 'দয়ালু' বলতে শিখিয়েছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কৌতুকের বিষয় আমরা এ সকলকে সত্য মেনে পরীক্ষায় পাশ করেছি।

গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সাম্রাজ্যবাদী বদমায়েশির মুখোশ উদ্‌ঘাটন করবার চেষ্টা হল। নেতৃত্ব এ দেশের প্রয়োজনে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন করবার কথাও চিন্তা করলেন। এই 'জাতীয় শিক্ষার' কল্পনা মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা দোষে-দুষ্ট হলেও এই উদ্‌ঘাটনেরও একটা মূল্য আছে।

এ কথাটা পরিষ্কার করে বোঝবার গুরুত্ব রয়েছে যে, ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব দীর্ঘকাল আমাদের সাম্রাজ্যবাদ অনুরাগী করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতাবোধের উন্মেষ ঘটিয়েছে ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকান বিপ্লব, আইরিশ

বিপ্লব, রাশিয়ান বিপ্লব—ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে এ-দীক্ষা আমরা কোনোকালেই গ্রহণ করিনি।

অথচ বারবার আমরা ব্রিটিশের কাছে আবেদনের থলি নিয়ে এগিয়েছি, তাদের চিত্তের ঔদার্যের নিকট আবেদন জানিয়েছি। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিশ্ব ঔপনিবেশিকদের ক্ষেত্রে প্রধান।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ইংরাজের সহনশীলতা গুণের যখন নির্জলা প্রশংসা করতে উদ্যত হন তখন আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশে ব্রিটিশের উলঙ্গ বর্বরতার কথা ভুলে যান। ভারতবর্ষে তুলনায় সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতা যদি কম হয়ে থাকে তা তার ঔদার্য নয়, তার কারণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আদরে পুষ্ট প্রথম থেকেই সাম্রাজ্যবাদ অনুরাগী শ্রেণীর সৃষ্টি। সাম্রাজ্যবাদের স্বমূর্তিতে উদগ্র হবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। জাগ্রত মধ্য শ্রেণীর এই passivity-ই সাম্রাজ্যবাদকে দীর্ঘকাল এদেশে নিরাপদ করেছে। 'সিপাহী বিদ্রোহকে' দমন করবার জন্যে ইংরাজ সেকালে যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছে সেই স্মৃতিকে ভুলতে গিয়ে আমরা ক্যানিংকে 'দয়ালু' বানিয়েছি। বুঝিনি ক্যানিংয়ের এই 'দয়া' সাম্রাজ্যবাদী নীতিরই অন্য কৌশল মাত্র।

ইংরাজি শিক্ষা প্রসঙ্গে যে য়ুরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান সভ্যতার কথা ওঠে সেটা বিশেষ করে সমগ্র য়ুরোপেরই দান, তজ্জন্য একক গৌরব ইংরাজের প্রাপ্য নয়। ইংরাজ ছাড়া ফরাসি কি জর্মান, যে কেউ হলেও বিষয়টা একই হত। ইংরাজের জানালা দিয়ে আমরা বিশ্বদৃষ্টি লাভ করেছি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর এতাদৃশ অচলা ভক্তিও আমাদের মেরুদণ্ডহীনতার প্রমাণ। ইংরাজ-রাজত্ব এদেশে পঞ্চবার্ষিক দুর্ভিক্ষেরই অন্যনাম, কখনোই প্রগতিশীল ভূমিকা বহন করে আসেনি। ইতিহাসের অচেতন হাতিয়ার মাত্র। শিল্পবিপ্লবের সূত্রপাত ইংলণ্ডে হতে পারে, প্রধানত ভারতবর্ষই তার প্রণামী জুগিয়েছে এও তেমনি সত্য। কাজেই শিল্প বিপ্লবের ফলশ্রুতি এদেশে কোনো অর্থ-নৈতিক বিপ্লবেরই তাগিদ দেয়নি বা উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীরর সৃষ্টি করেনি। বস্তুত ব্রিটিশের সহবাসে উনিশ শতকে যে-রেনেশাঁসের প্রচার আমরা করি তা সাম্রাজ্যবাদ সহযোগী শহুরে মধ্য শ্রেণীরই নকল রেনেশাঁস যা য়ুরোপীয় রেনেশাঁসের মতো কোনো গুণগত পরিবর্তনও সূচিত করেনা। তা বাস্তবে সাম্রাজ্যবাদ পৃষ্ঠপোষণাপুষ্ট ধর্ম বা সমাজ-সংস্কারের কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক চিন্তার কোনো আলো সেখানে বিকীর্ণ হয়নি। কারণ ততদিনে

এই প্রধান রেনেশাঁসওয়ালারা শাসনে ও শোষণে ইংরাজের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে গেছে।

দৃষ্টান্ত দিয়ে কেউ কেউ বলবেন, ইংরাজি সাহিত্যের মধ্যে আমরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের আস্বাদ পেয়েছি। এটা বিশ্বাসের কথা, সত্যের কথা নয়। ইংরাজি সাহিত্যের মতো বিশ্বে জার্মান সাহিত্য আছে, ফরাসি সাহিত্যও আছে, (গ্রীক সাহিত্য কোনো দেশের পৈতৃক সম্পত্তি নয়, আশা করি) এবং কোনোটিই কারুর তুলনায় উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট নয়! সাহিত্যে এলিজাবেথ বা ভিক্টোরিয়া যুগকে আমরা পরীক্ষা পাশের জন্যে পড়েছি, ইস্কুলে বা কলেজের পাঠ্যপুস্তকে আমাদের সাহিত্যবোধ কখনোই জাগেনি। শেকসপীয়র-মিলটন-বায়রন সম্পর্কে আমাদের বিদ্যা অ্যাকাডেমিক মাত্র। তৎকালীন সমাজে এইসব লেখক সম্পর্কে বস্তুগত বিচারের শিক্ষা আমরা ইস্কুল-কলেজে পাইনি, তা আমাদের ব্যক্তিগত সমাজদৃষ্টি ও অধ্যয়নেরই ফল। আমাদের সাহিত্যিকেরা অন্ধের মতো ইংরাজি সাহিত্যকে মকশো করেছেন এবং আজো পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে সাক্ষ্য মানলে, ভিক্টোরিয়ার যুগকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি। সাহিত্যবোধের নামে আমরা সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাব্যবস্থার চশমাকেই নাকে চাপিয়েছি। ফলত আমাদের সাহিত্য মূলত কলোনিয়াল সাহিত্য ছাড়া কিছু নয়। শেলী বা বায়রনের সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমাবেগ আমাদের এমনভাবে মুগ্ধ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই তাঁদের র‍্যাডিকাল চিন্তা ও স্বাধীনতা স্পৃহাকে আবরণ দেয়া হয়েছে। সনাতনী ওআর্ডস্বার্থকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হয়েছে।

হ্যাঁ, ইংরাজ আমাদের বিশ্বসাহিত্যের জানালা খুলে দিয়েছে, কিন্তু সে-সাহিত্য সেনসর্‌ড, কনট্রোল্‌ড, যেন সাম্রাজ্যবাদী নোংরা দাঁতটা প্রকাশ না হয়ে পড়ে। অর্থাৎ ইংরাজ পরম অনুগ্রহে যা পাঠিয়েছে তাই আমরা চর্বিত-চর্বণ করে কৃতজ্ঞতার ঢেকুর তুলেছি।

আর, য়ুরোপীয় বিজ্ঞানের দানের কথা? আজো পর্যন্ত আমাদের দেশে বিদেশী যন্ত্রপাতি এসেম্বল করে' মেড ইন ইণ্ডিয়ার ছাপ মারতে হয়। বেসিক্ কেমিকেলস-এর জন্যে বিদেশের মুখ চেয়ে থাকতে হয়।

আমাদের বিজ্ঞানীদের স্বাধীন গবেষণার ক্ষেত্রে পদে পদে ইংরাজ প্রভু আমাদের বাধাই দিয়েছে। জগদীশ বসু বা প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিভার কী-অপব্যবহার হয়েছে বিচার করলেই ধরা পড়বে।

আজ ইংরাজের অনুগ্রহে আমাদের রাজনীতি চেতনা যে কী-পরিমাণ অন্ধ তর্জমা, আজো পর্যন্ত দেশের হাল যা হয়েছে সেটাই চরম দৃষ্টান্ত। অবশ্য, স্বীকার করতেই হবে এই রাজনীতি চেতনা ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর রাজনীতি যা তাকে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী চরিত্রে উন্নীত করে ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণীতে রূপান্তরিত করেছে।

দৃষ্টান্ত না-বাড়িয়ে এখন এই সিদ্ধান্তে আসা যায় এদেশে ইংরাজি শিক্ষাপদ্ধতি সাম্রাজ্যবাদেরই দোসর। স্বাধীনতা-স্পৃহার জন্য ইংরাজিয়ানাকে অস্বীকার করেই।

কোনো সাম্রাজ্যবাদই তার অস্তিত্বের প্রয়োজনে উপনিবেশের মানুষের হাতে তার মৃত্যুবাণ তুলে দিতে পারেনা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও তাই কোনো ব্যতিক্রম নয়।

সাম্প্রদায়িকতার উৎস সন্ধানে

বাঙলা দেশের ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বাগ্রে অনুধাবন করার প্রয়োজন। পাঁচ শতকে গুপ্ত যুগ থেকে এ দেশে ব্রাহ্মণ্যবাদ ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে। যথারীতি ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অন্যদিকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষের জীবন সংগ্রাম যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী আন্দোলনে। তার নাম বৌদ্ধধর্মই হোক, বৈষ্ণবধর্মই হোক কিংবা ইসলামধর্মই হোক।

পরিবর্তিত পটক্ষেপে এই উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই আবার মুঘল শাসনে দরবারে যেমন উচ্চপদ গ্রহণ করেছে তেমনি হিন্দু বেনিয়া শ্রেণী সরকারের ফিনানসিয়ার হিসাবে এবং ব্যবসা বাণিজ্যের লগ্নিদার হিসাবে প্রচুর প্রভাব খাটিয়েছে।

সতেরো শতকের তুর্কী-আফগান ইসলামী আমলে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এতাবৎকাল অবহেলায় স্থানীয় নিম্নবর্ণের জনসাধারণ মুক্তির আশায় বিশেষ করে বিস্তৃত পূর্ব বাঙলায়, দলে দলে ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলামধর্মকে আলিঙ্গন করল। কিন্তু তথাকথিত তুর্কী-আফগান অভিজাত শ্রেণীর ব্যবহার উচ্চবর্ণের হিন্দুদের চেয়ে কিছু বিপরীত হলনা।

শাসক পার্টির শ্রেণী চরিত্রের সঙ্গে উচ্চবর্ণের হিন্দু বা মুসলমান একীভূত হয়ে তাদের শ্রেণীগত ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যেই সম্পাদন করেছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা, মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে ভেঙে পড়ছে তখন এই বাঙলাদেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ঔরঙ্গজেবের রাজসভার প্রধান চিকিৎসক ভিনিশ, মানুচীর সাক্ষ্য: "All things are in plenty here. fruits, pulse, grain, muslins, cloths of gold and silk."

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি খাঁর আমল বাঙলাদেশের গৌরবময় যুগ।

কিছু ভূম্যধিকারী ও 'বানিয়া' হিন্দুদের যোগসাজসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথাকথিত "পলাশীর যুদ্ধ" নামক যে ঘটনাটি ঘটালেন তা

আসলে, কে. এম. পানিক্করের ভাষায় "a transaction not a battle, a transaction by which the compradors of Bengal led by Jagath Seth sold the Nawab to the East India Company." পরবর্তীকালে ভারতীয় শাসক শ্রেণী যে-ভূমিকা নেবে তারই ঐতিহাসিক ইঙ্গিত কী এই ঘটনার মধ্যে নিহিত নেই? শাসক হিসেবে ব্রিটিশের নিশ্চিত পদপাত যে তাদের দূরদৃষ্টিতে ছিল এই ঘটনা এবং যখনি যে শাসক এসেছে তারই সহযোগী শ্রেণী হিসাবে এদের গাঁটছড়া বন্ধন আরেকটি সত্য উদ্ভাসিত করে যে, সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই শ্রেণীর আত্যন্তিক শ্রদ্ধা-প্রীতি-আস্থা তাবৎ উচ্চবিত্ত মানসকে আপ্লুত করে রেখেছে। সাম্রাজ্যবাদের প্রতি এই জাতীয় নিঃশর্ত ভালোবাসা বিশ্বের ঔপনিবেশিক শোষণে জর্জরিত কোনো মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রে নেই! এ-বিশেষত্ব সম্পূর্ণ-"ভারতীয়"।

ভূমিরাজস্বকে পাকাপাকি ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে নেবার স্বার্থে, প্রাচীন সামন্ত প্রথাকে নবীকরণের গরজে এবং মুহুর্মুহু কৃষকদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে এমন একটি জমিদার শ্রেণী গড়ে তোলবার জরুরি প্রয়োজন, যারা কৃষকদের বিক্ষোভের বিরুদ্ধে ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তথা ব্রিটিশ-প্রদত্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় স্থিত হয়ে ইংরাজপ্রভুকে লুঠের ভাগ দেবে!

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই ব্যবস্থা।

১৮২৮-এ গভর্নর জেনারেল বেন্টিঙ্কের মন্তব্য: "If security was wanting against populas tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though failure in many other respects and in most essentials, has this great advantage at least of having created a vast body of reach landed proprieters deeply interested in the continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of the people."

মুঘল আমলে যে মুসলিম ভূস্বামী তথা রাজস্ব আদায়-কর্তারা যুক্ত ছিলেন তাঁদের সৌভাগ্যের দিন অস্ত চল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে চাকরি ও নানাবিধ সূত্রে যে হিন্দু বিত্তশালী সম্প্রদায় বিশ্বাসভাজন হয়েছিলেন তাঁরাই এই নতুন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে "নতুন জমিদারে" পরিণত হলেন। অর্থাৎ হিন্দু উচ্চবর্ণ শ্রেণী—ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-ক্ষত্রিয়।

এই ভূস্বামী স্বার্থ বিজড়িত মধ্য শ্রেণীই উনিশ থেকে বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাম্পিয়ান হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে আড়াল করে ইংরাজি শিক্ষা-সভ্যতা-শাসন-বিচার-পদ্ধতি যাবতীয় বস্তুর "অনুগত ভারতীয় প্রজা" হিসাবে পরম সমর্থক হয়ে উঠল। বিচিত্র কী, মুঘল শাসনে "ফার্সী" সরকারিভাষা হওয়ায় সেদিন এঁরাই সরকারি চাকরি করজা করতে ছুটে গিয়েছিলেন। সেই সুবাদে এঁরা "ইংরাজি" ভাষারও প্রচণ্ড সমর্থক

রামমোহন রায় কৃতজ্ঞতা জানালেন এই ভাষায়: "Indians are fortunately placed by providence under the protection of the whole British Nation, or that king of England and his Lords of Commons are their Legislators, and that they are secured in the enjoyment of the same civil and religious privlieges that every Briton is entitled to England.' খ্রীস্টান জনসাধারণের নিকট আবেদনে তিনি আরো জানালেন "the Supreme Disposer of the universe for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former Rulers, placed it under the Government of the English." ইত্যাদি।

শাসক চরিত্রের বদলের সঙ্গে সঙ্গে এধরনের আনুগত্যের বদল এ দেশীয় সহযোগী শ্রেণীর পক্ষেই সম্ভবপর। অংশতই ব্রিটিশ শাসনের এই কল্যাণকারী ভূমিকায় গদ্‌গদ হয়ে-ওঠা রামমোহনের পক্ষেই স্বাভাবিক, কারণ এঁরাই সর্বাগ্রে শাসকের কাছে প্রভুভক্তির পুরস্কার পেয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনের পূর্ববর্তী মুসলিম শাসন রামমোহনের মতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের স্বার্থে কী পরিমাণ ঘা দিয়েছে পুরোপুরি জানা না-থাকলেও রামমোহন ফার্সী শিখেছিলেন তদানীন্তন সরকারি চাকরির সুবিধে গ্রহণ করবার জন্যেই। এবং সবচেয়ে কৌতূহলের, রামমোহনের যে শিব "রাজা" খেতাবে মণ্ডিত তাও মুঘল সম্রাটের অনুগ্রহে প্রাপ্ত

এবার গোটা পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে উনিশ শতকে মুসলিম মধ্যশ্রেণীর দুর্বলতা আমাদের ইতিহাসে গভীর স্বাক্ষর ফেলল। লখনৌ, দিল্লি, লাহোর, এই মুসলিম কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি যখন অন্ধকারে ডুবছে তখন ব্রিটিশ কেন্দ্র—কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ আলোর রোশনাইয়ে

ঝলমল করে উঠেছে। সরকারি সহযোগিতার দক্ষিণহস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দিকে প্রসারিত হয়েছে—চাকরি, নানাবিধ বৃত্তি এবং স্থানীয় ব্যবসাবাণিজ্যে হিন্দুরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করেছে।

এই অর্থনৈতিক তারতম্য দুই প্রধান সম্প্রদায়—হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন প্রকট হয়ে উঠল যে, ১৮৭০ থেকে তথাকথিত "সাম্প্রদায়িক সমস্যা" কে সুযোগ মতো ব্যবহার করা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্যতম রাজনৈতিক অস্ত্র হয়ে উঠল। এই "ভাগ করো এবং শাসন করো" নীতি ইংরাজের আয়ুষ্কাল এদেশে প্রলম্বিত করেছে। সাম্রাজ্যবাদের ভাষায় "Communalism needs only to be well started and then it thrives of itself."

ব্রিটিশ শাসনের সূচনা থেকেই যে কাঁটা বিদ্ধ হল তাতে ইসলামী শাসনে সুবিধাভোগী অভিজাত মুসলমান এবং সংখ্যাগুরু দরিদ্র মুসলিম চাষিসমাজ এই বিদেশী শাসককে ও সহযোগী উপরতলার হিন্দু সম্প্রদায়কে সন্দেহ, অবিশ্বাস এবং তাদের অনন্ত দুর্দশার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণরূপে গণ্য করেছেন।

আমাদের বিশ শতকের ত্রিশ দশকের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসের জাতীয় আন্দোলনে ঘৃণিত জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ মারফত রায়তদের, বিশেষ করে সংখ্যাগুরু মুসলমানদের রক্ষার্থে কোনো প্রস্তাবই নেয়া হয়নি।

জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বে উপরতলার হিন্দুদের প্রাধান্য থাকার কারণেই দীর্ঘদিন এমন ব্যবস্থা নেয়া যায়নি।

কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জী ও সুরেন বাঁড়ুজ্যের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন প্রথম দিকে কৃষকদের স্বার্থ ব্যাপারে আগ্রহ দেখালেও জোড়াসাঁকো কবলিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বরাবরই জমিদারি স্বার্থেরই পোষণ করেছে। পরবর্তীকালে হিউম সাহেবের উদ্যোগে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের জন্ম হলেও স্মরণ রাখতে হবে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষেই তা গঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের অনুযায়ী একটি বিরোধী পক্ষ সৃষ্টি করা। অস্থির জনতা ও সরকারের একগুঁয়েমির মাঝখানে একটি সেফ্‌টিভালফ্‌ তৈরি করা। উল্লেখযোগ্য, সুরেন বাঁড়ুজ্যের ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নীতির সঙ্গে এই সদ্যোজাত কংগ্রেসের কোনো মিল ছিলনা। স্বাভাবিক কারণে কংগ্রেসের জন্মলগ্নে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের

নেতাদের আহ্বান আসেনি। কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় প্রস্তুতির জন্যে যখন হিউম এসে দেখলেন বাঙলাদেশে এই জনপ্রিয় নেতাদের বাদ দিয়ে কিছু করবারই উপায় নেই তখন বাধ্য হয়ে নেতাদের সাহায্য নিতে হল।

কিন্তু কংগ্রেসের কাজ সম্বৎসরে কয়েক দিনের উৎসব জাতীয় কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ রইল। অশ্বিনী দত্ত পরিহাস করে যার নাম দিয়েছিলেন 'তিনদিনের তামাশা'।

ইতিমধ্যে শ্রেণীস্বার্থে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভূস্বামী এবং সরকারী পদমর্যাদায় যুক্ত উচ্চ মধ্যশ্রেণীর হিন্দুরা হিন্দু পুনর্জাগৃতির স্বপ্নে এমন বিভোর হয়ে গেলেন যে, ধর্ম-রাজনীতি মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের বাতাবরণ পর্যন্ত এই ধর্মের ধূপধুনোর গন্ধে অন্ধকার হয়ে এল।

১৯০৫—১৯১১ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠল তাতে করে দুই প্রধান সম্প্রদায়কে সামিল করবার সুযোগ এসেছিল। দেখা গেল ঢাকার প্রতিক্রিয়াশীল নবাব ছাড়া অন্য মুসলিম নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁদের রায় দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আবদুল রসুল, ময়মনসিংহের আবদুল হালিম গজনভি, বর্ধমানের আবদুল কাসেম এবং লিয়াকত হোসেন প্রমুখ। এমন কী আলিগড় মুসলিম কলেজের • সম্পাদক মোহসীন-উল-মুলক জানাচ্ছেন, তরুণ ছাত্রেরা কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, তাদের আটকে রাখা যাচ্ছেনা। উপরন্তু বিদেশী বস্ত্র বর্জনের পক্ষে এই স্বদেশী আন্দোলনে মুসলিম তাঁতীরা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের জাতীয় নেতৃবর্গ, সুরেন বাঁড়ুজ্যেকে বাদ দিলে, আন্দোলনের এই সেকুলার চেহারাটিকে ধরতে চেষ্টা করলেন না। হিন্দু ধর্মীয় সংস্কার এমন একটা আনুষ্ঠানিক অঙ্গ হয়ে উঠল যে বঙ্গভঙ্গের ঘোষিত দিন ১৫ অক্টোবর ১৯০৫ থেকে শুরু হয়ে গেল রাখীবন্ধনের ধুম, হিন্দুরা ঘটা করে গঙ্গাস্নানে পবিত্র হলেন, কালীমূর্তির সামনে শপথ নিলেন, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ মুখরিত হল।

জাতীয় আন্দোলনে এ জাতীয় ধর্মীয় সংস্কার অন্য সম্প্রদায়ের আবেগকে বাধা দেবে কি না এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা হিন্দু নেতাদের মনেও এলনা। যদিও বরিশালে মুসলিম জনসাধারণ এই স্বদেশী জোয়ারে যোগ দিয়ে গণ সঙ্গীতে এবং হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে "বন্দেমাতরম্" "আল্লাহো আকবর"

ধ্বনিতে পরিস্থিতিকে মাতিয়ে তুলেছিলেন, তাহলেও এটি স্থানীয় ঘটনা।

এই আন্দোলনের দুর্বলতাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বাভাবিক ভাবে কাজে লাগাল। ১৯০৬ এর ৩০ ডিসেম্বর আগা খান ও ঢাকার নবাব সালিমুল্লা খানের নেতৃত্বে জন্ম নিল মুসলিম লীগ। লীগ বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ঘোষণা করল: এতদ্বারা মুসলিম জনসাধারণের মঙ্গল হবে, কাজেই মুসলমানরা বয়কট আন্দোলন বন্ধ করুন।

পূর্ববঙ্গে স্বদেশীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধানো হল। কুমিল্লা ও জামালপুরে সাম্প্রদায়িক দাংগার আগুন জ্বলে উঠল। ভাইসরয় লর্ড মিনটো এই সাম্প্রদায়িকতায় উল্লসিত হয়ে মন্তব্য করলেন "they will be a useful reminder to the people in England that the Bengali is not everybody in India, in fact the Mohammedan Community, when roused, would be a much stronger and more dangerous factor to deal with then the Bengalis."

যাই হোক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বাঙলা দেশকে ছাপিয়ে সর্বভারতীয় জনমতে বিস্তীর্ণ হলে এবং বাঙলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের প্রচণ্ড গতিবেগে ইংরাজ আতংকিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৯১১তে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হল।

কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার কাঁটা সমানে বিঁধেই রইল। এই আন্দোলন সার্বিক মুসলিম জনসাধারণের উপর কোনো স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারল না।

এই বিষয়টি অনুসন্ধান করবার প্রয়োজন রয়েছে যে, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। হিন্দু জমিদারদের স্বার্থ ছিল পূর্ববাঙলার জমিদারির অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখা। বঙ্গ বিভাগ হয়ে গেলে তাঁদের অপূরণীয় ক্ষতি হত। অন্যদিকে সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রজাদের স্বার্থ জমিদারের সংখ্যাতীত বেআইনী করের হাত থেকে কিছু স্বস্তি পাওয়া। একথা ঠিক জমিদার হিসাবে মুসলিম জমিদারও মুসলিম প্রজাদের প্রতি সদয় নন। কিন্তু মুসলিম জনসাধারণের ধর্মগত প্রশ্নের স্বাভাবিক উন্মাদনা তাদেরও বাস্তব ঘটনাটা সব সময়ে বুঝে উঠতে দেয় নি। রাজনৈতিক অজ্ঞতা তো আছেই।

সুরেন বাঁড়ুজ্যের মতো 'সেকুলার' রাজনৈতিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা এবং বিভিন্ন সময়ে গ্রাম-বাঙলার কৃষক অবস্থার প্রতি যিনি সহানুভূতিশীল, তিনিও শেষ পর্যন্ত শ্রেণী সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে পারলেন না।

'ভারত সম্রাট' সপ্তম এডোয়ার্ডের শোকসভায় তিনিও প্রকাশ্যে নতজানু হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে চূড়ান্ত করলেন।

গান্ধীজির আবির্ভাব ঘটল রাজনৈতিক মঞ্চে। প্রথম থেকেই গান্ধীজি রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের মিশেল দিয়ে রাতারাতি 'অবতারে' পরিণত হলেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমূহ দুর্বলতাগুলি রয়ে গেল। সম্প্রদায়, বর্ণের বিশিষ্ট সমস্যাগুলিকে পাশ কাটিয়ে তিনি শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

১৯২০-২২-এর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক জনসাধারণের গণ-আন্দোলনের রূপ নিতে উদ্যত হল। ১৯২২এ চৌরিচৌরায় নিগৃহীত কৃষক আন্দোলনকারীদের রোষে বাইশজন কনেস্টবল অগ্নিদগ্ধ হলে গান্ধীজি মাঝপথেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন। ইতিহাসে এর নাম 'বরদলই হল্ট'। কংগ্রেসের প্রস্তাবে পরিস্থিতিটির চেহারাটা পরিষ্কার। "The working committee advises Congress workers and organizations to inform the peasants that withholding of rent payment to Zaminders is contrary to the Congress resolutions and injurious to the best interests of the country." একই প্রস্তাবে জমিদারদের আশ্বাস দেয়া হল "that Congress movement is in no way intended to attack their legal rights and that even where the ryots have grievances, the committee declares that redress be sought by mutual consultation and arbitration".

গান্ধীজির নেতৃত্বে এদেশে যে গণ-আন্দোলন বারবার প্রস্তুত হয়ে উঠেছে গান্ধীজির শ্রেণীগত আনুগত্য এবং গণ-আন্দোলন ভীতি তাকে সার্থক রূপ নিতে দেয়নি। কারণ গান্ধীজির সীমাবদ্ধ চেতনায় বিভিন্ন শ্রেণীর স্বার্থের পরিপোষণ সম্ভব। নয়। জমিদার ও কলকারখানার মালিকদের পৃষ্ঠপোষণা হারানো কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। নির্যাতিত কৃষক ও শ্রমিকদের পক্ষাবলম্বনও অসম্ভব। ফলত, কংগ্রেসী আন্দোলন অভিজাত-উচ্চ-মধ্যবিত্ত শহুরে বাবু শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল। নীচুতলার জনসাধারণ এই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পর্কে সন্দেহ, সংশয়, অবিশ্বাস করতে শুরু করল।

বিশেষ করে বাঙলাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলিম কৃষক সাধারণ এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উঠলেন। বিশেষত্বটি স্মরণ রাখতে

হবে এদেশের প্রধান জমিদারগোষ্ঠী হিন্দু এবং এঁরা কংগ্রেসের উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক।

১৯২৮-এ আর একবার সুযোগ এসেছিল। বেঙ্গল টেনানসি অ্যাক্টে কৃষক প্রজাদের জমির উপর অধিক স্বত্ব প্রতিষ্ঠার কথা উঠলে আইনসভার কতিপয় মুসলিম সভ্য ছাড়া স্বরাজ্য পার্টি 'হিন্দু জমিদারের' স্বার্থে প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল।

এই শ্রেণীস্বার্থের সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা নামক বিষকে একটু একটু করে সমাজদেহের রক্তে সঞ্চালিত করেছিল।

মুসলিম নেতৃত্ব কৃষকদের এই অসন্তোষকে নিজেদের প্রয়োজনে যখন ব্যবহার করতে চাইল তখন মুসলিম বৃহত্তর জনসাধারণ সহজেই বশীভূত হলেন।

এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রাক্তন বদ্‌বুদ্ধিই আগামী দিনে জয়লাভ করল। দেশ ভাগ হল।

কাজেই সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যে প্রয়োজনেই কাজে লাগানো হোক না কেন তার বাস্তব অর্থনৈতিক প্রশ্নটিকে বাদ দেওয়া যায়না।

উনিশ শতকী বুদ্ধিজীবী মানস

ব্রিটিশের জয়গান করে বাঙালী বুদ্ধিজীবীর প্রধান অংশের যে যাত্রা একদিন শুরু করেছিল আজো সে-ঐতিহ্য সে ধারণ করছে বললে ভুল বলা হয় না। দিল্লিতে ১৮৫৭-তে যখন জনতা ব্রিটিশ সরকারকে উৎখাত করবার দুর্ধর্ষ সংগ্রাম করছেন তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবী পরম কৃতার্থতার সঙ্গে শাসনে ও শোষণে ব্রিটিশের সহযোগীর ভূমিকা নিয়েছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দৌলতে তখন একটি শক্তিশালী ভূস্বামী শ্রেণী গড়ে উঠেছে, যাদের একমাত্র কাজ চাষীদের লুণ্ঠন করে ঔপনিবেশিক শোষণের জোয়ালে বেঁধে-দেয়া। রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ এ দেশে সেই সব ভূম্যধিকারী, যাঁরা জমিদারি স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। একদিকে জমিদারি ব্যবস্থাকে সমর্থন অন্যদিকে দেশের হিতসাধনে সংস্কার করবার শুভেচ্ছা—তাঁদের চরিত্রকে দ্বিমুখী করে তুলেছে। অথচ শ্রেণীস্বার্থজনিত চিন্তায় এর অন্যথা হবার উপায় ছিল না। কারণ জমিদারি স্বার্থের সঙ্গে ঔপনিবেশিক শোষণের শেকল বাঁধা থাকলেও এই সব মনীষীদের অস্তিত্ব প্রতিপত্তি রক্ষার সমস্যাটিও ছিল এর মধ্যে নিবদ্ধ। নিজেদের পায়ে কুড়ুল মারতে তো এঁরা পারেন না। ততদিনে য়ুরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার চোখধাঁধানো ঔজ্জ্বল্য তাঁদের দেশ সম্পর্কে একটা হীনমন্যতা বদ্ধমূল করে দিয়েছে। তাঁরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন ইংরেজ না এলে আমরা ভারতীয়েরা অন্ধকার নরক থেকে এত শীঘ্র মুক্তি পেতে পারতাম না। এই সব মনীষীরা ভুলে গেলেন, যে-"শিল্পবিপ্লব" ইংলণ্ডের একটি গৌরবময় অধ্যায়, তার কাঁচামাল গেছে ভারতের থেকে, এ-দেশকে অমানুষিক শোষণ করে। মুঘলযুগেও যে উন্নত অর্থনৈতিক ঐতিহ্য আমাদের ছিল, যার স্বাক্ষর তার কৃষি ও তাঁত, রেশম ও লবণ শিল্পে, তাকে গুঁড়িয়ে ভেঙে চুরমার করে দেয়া হল। ভারতীয় বেনিয়ারা যাঁরা এই সব শিল্পে টাকা লগ্নি করতেন আইন করে তা নিষিদ্ধ করে তাঁদের কেবলমাত্র জমিতে লগ্নি করতে বাধ্য করা হল। এদিকে তখনো যথেষ্ট কৃষি উপযোগী জমির ব্যবস্থা না থাকার জন্যে জমিতে পড়ল

অত্যধিক চাপ, তার ফলে জীবিকার ক্ষেত্রেও বেকারের সৃষ্টি হল। জীবিকার নানান উপায় থাকার জন্যে যা এতদিনও প্রকট হয়নি।

অন্যদিকে একমাত্র ঔপনিবেশিক শোষণের খাদ্য জোগাতে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি হল সেখানে কৃষির উন্নতির জন্যে না ইংরাজ না জমিদার কারুরই সেচ ব্যবস্থার জন্যে মাথাব্যথা হল না। যেটা সর্বাপেক্ষা জরুরি ছিল তাকে পরিহার করে, ইংরাজ এদেশের সম্পদকে আরো দ্রুত লুঠ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। এ কথা স্মরণ করা কর্ত্তব্য যে ঔপনিবেশিক শোষণের কৌশলকে ত্বরান্বিত করবার একমাত্র উদ্দেশ্যেই রেলপথ প্রবর্ত্তন করা হয়েছিল।

আমাদের মনীষীরা এ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় বেদনাদায়ক নিশ্চুপ। তাঁরা অধিক পরিমাণে ইংরাজ শাসনে অংশ নেবার জন্যে সরকারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্যমূলক পদক্ষেপ মাধ্যম-সহ ইংরাজি শিক্ষার প্রবর্ত্তনে সক্রিয় সমর্থক হয়ে উঠলেন। ভাষা যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষারই আর একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার, সে-সত্যটা তাঁদের চোখে ধরা পড়ল না। ইংরাজদের যন্ত্রে-প্রস্তুত সামগ্রীর এ দেশে ঢালাও ব্যবসা করতে গেলে যে আচার-আচরণে কালো চামড়ার সাহেব তৈরি করতে হবে সাম্রাজ্যবাদ তা বুঝেছিল। তাই নগরকেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষার প্রতি ইংরাজ সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করে গ্রাম-ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী বিপদকে দীর্ঘকাল এড়িয়ে গেছে। বলা বাহুল্য ইংরাজের এই উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল. ইংরাজি শিক্ষার কল্যাণে শহরে ইংরেজিনবীশ বাবুশ্রেণীর সঙ্গে গ্রামীণ মানুষের আত্মিক সম্পর্ক পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেল।

এ কথা স্বীকার করাই নিরাপদ যে, ভূস্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যে উনিশ শতক থেকে বুদ্ধিজীবীরা যে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তা বৃহত্তর জনগণের কল্যাণ আনেনি। তাই দেখা যায় জমিদারের বে-আইনী আদায়ের অজুহাতেই হোক কী নীল বা সাঁওতাল সমাজের কৃষক বিদ্রোহের কারণেই হোক, সেকালের প্রধান বুদ্ধিজীবীগণ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেননি। রামমোহন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মতো মনীষীরাও চিরস্থায়ী বন্দো-বস্তের কুফল সম্পর্কে অবহিত হওয়া সত্ত্বেও তা রদ করার স্বপ্ন দেখতেও ভালোবাসেননি। তার কারণ কী এই নয় যে সামন্ততন্ত্রের বিরোধিতার অর্থই ছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা? 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' গ্রন্থ দুটি সম্পর্কে বিরোধিতা বঙ্কিমের এই মনোভাব থেকেই।

এটি একটি জনপ্রিয় থিসিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার দাখিল হয়েছে যে ব্রিটিশ শাসন এদেশে একটি প্রগতিশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু এটা মনে করা হয়ে থাকে ইংরাজ এদেশে বুর্জোয়া বিপ্লবের উৎসগুলোকে খুলে দিয়েছে। যেমন, এক-শাসন-কর্তৃত্বে সারা ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, উৎপাদনে যন্ত্রকে হাজির করেছে, যদিচ নিজস্ব স্বার্থেই। ফলশ্রুতি নাকি ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ।

এবং আঠারো শতকের শেষে ও উনিশ শতকের প্রারম্ভে রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরই ব্রিটিশ শাসকের পায়ে পায়ে গড়ে ওঠা এই অর্থ-নৈতিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন।

ব্রিটিশ স্বার্থের গোমস্তাগিরি ও অজস্র অর্থ জমিতে লগ্নি করে জমিদারি, বকলমে ঔপনিবেশিক শোষণের অংশীদার এবং বৃহত্তর জনগণের স্বার্থ বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মনীষীগণ কী জাতীয় ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন আজকের সচেতন পাঠকই তা বোঝবার চেষ্টা করুন।

এদেশে সাম্রাজ্যবাদী শোষণকে অব্যাহত রাখবার জন্যে শিল্পোদ্যমে না গিয়ে ব্রিটিশ প্রাচীন জগদ্দল ফিউডালিজমকেই অক্ষত রেখে নতুন কায়দায় তাকে ঔপনিবেশিক শোষণের চরিত্রের সঙ্গে মজবুত করে বেঁধে দিল। অর্থ নৈতিক বিপ্লবের স্বপ্নদর্শীরা ক্রমান্বয়ে জমি কিনে বৃহৎ জমিদারে পরিণত হতে লাগলেন। রামমোহন-দ্বারকানাথ কেউ এর বাইরে নন্।

কথাটা স্পষ্ট করে বলবার সময় এসেছে যে দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ কাঠামোকে ভাঙবার কোনো চেষ্টাই করেনি ইংরাজ, যাতে আমাদের দেশে নতুন অর্থনৈতিক বিপ্লব সাধিত হতে পারে।

আসলে এই মনীষীরা ব্রিটিশ স্বার্থের সহযোগী হয়ে এমন সব সংস্কার মূলক কাজে হাত দিয়েছেন যাতে ব্রিটিশের আঁতে ঘা লাগেনি। রামমোহন 'সতীদাহ রদের' আন্দোলন না করে যদি 'জমিদারি উচ্ছেদের' আন্দোলন করতেন, যদি সার্বিক অর্থনৈতিক বিপ্লব আনবার প্রয়োজনে ফিউডালিজমের বিরুদ্ধে শিল্পায়নের প্রতি উৎসাহ দিতেন তাহলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাঁকে কী রকম খাতির করত ? দ্বারকানাথের 'প্রিন্স' হবারও সৌভাগ্য হতনা।

বস্তুত এদেশে আধুনিক শিল্পায়নের সূত্রপাত ব্রিটিশ পুঁজি যখন পশম, পাট, কাগজ শিল্পে খাটতে শুরু করল, সেই সময় বম্বের পার্সী সম্প্রদায় পূর্ব

সমুদ্রে ছিল ব্রিটিশ বাণিজ্যের কনিষ্ঠ পার্টনার। কিন্তু সে অবস্থাও বদলে গেল উনিশ শতকের শেষ দশকে। বঙ্গের বস্ত্রশিল্প চালু হল বটে কিন্তু তার নীতি নির্ধারণ করবে ল্যাঙ্কাশায়ার। ১৮৭৫-এ লর্ড লিটনের সরকার মোটা সুতী বস্ত্রের উপর আমদানী কর রহিত করল। শুধু তাই নয়, ১৮৯৪ থেকে ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর অন্যায় কর চাপিয়ে দেয়া হল। অবশ্যই সবই ল্যাঙ্কাশায়ারের স্বার্থে।

রামমোহন, যতদূর জানা গেছে, জমি ছাড়া আর অন্য কোথাও টাকা লগ্নি করেননি। কাজেই জমিদারি ছাড়া তাঁর প্রতিভা শিল্প বাণিজ্যকে স্পর্শ করেনি। সেদিক দিয়ে দ্বারকানাথের কিছু প্রয়াস দেখা যায়। সেটাই বিচার করে দেখা যেতে পারে।

জ্যাঠামশায়ের দত্তক হিসাবে দ্বারকানাথ প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হলেন। তারপর কোম্পানির লবণ ও অহিফেন দপ্তরের দেওয়ান হয়ে তাঁর সম্পদ আরো বৃদ্ধি পেল। শিল্পক্ষেত্রে তিনি মন দিলেন। নীলকুঠি কিনলেন। চিনি চাষের পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। অতঃপর বেন্টিঙ্কের সুপরামর্শে কার টেগোর এণ্ড কোম্পানি নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও খুললেন। দ্বারকানাথের মতে "It is the first instance in which an open and avowed partnership had been established between the European and the Bengal merchant" ১৮৩৭-এ এই কোম্পানি মেসার্স আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং এর কাছ থেকে চিনাকুরী খনি খরিদ করল এবং ১৮৪৩-এ কার্ টেগোর এণ্ড কোং এর সঙ্গে গিল্‌মোর, হোমফ্রে এণ্ড কোং-যুক্ত হয়ে বেঙ্গল কোল কোম্পানির উদ্ভব হল। দ্বারকানাথ ক্যালকাটা স্টিম টাগ্ এসোসিয়েশনের ডিরেক্টার নিযুক্ত হয়ে ১৮৩৬-এ Forbes নামে একটি জাহাজ কিনলেন। টাগ্ এসোসিয়েশন মাসে ৩,০০০ হাজার টাকা লাভ করলে স্থানীয় সংবাদপত্র তাদের ডাকনাম দিল "ঠগ"।

কিন্তু দ্বারকানাথের সমূহ শিল্পোদ্যম ফেঁসে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী প্রতিবন্ধকতায়। দ্বারকানাথ আর্তনাদ করে বলে উঠলেন "taken all which the natives possessed, their lives, liberty and property, and all were held at the mercy of Government"

এই ভাবেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশে "অর্থনৈতিক বিপ্লবের" শুরু

করেছিল যার গুণগানে অকারণ আমরা সে ভূমিকাকে পরোক্ষত "প্রগতিশীল" বলে ব্যাখ্যা করতে ভালোবাসি।

ব্যাপারটা কি বুঝতে খুবই কষ্ট হয় যে, পরোক্ষভাবেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ এদেশে বুর্জোআ বিপ্লবের উৎসমুখ তো খোলেইনি বরঞ্চ দীর্ঘ ঔপ-নিবেশিক শোষণাগাররূপে, কাঁচা রসদ সরবরাহের মৃগয়াক্ষেত্রভূমিতে চিরস্থায়ী রাখবার জন্যে ফিউডালিজমকে উৎসাহিত করেছিল। এদেশে বুর্জোআ শ্রেণী —সদর্থে, গড়ে উঠতে সময় লেগেছে। ব্রিটিশের প্রতিবন্ধকতাই তাকে যথেষ্ট বিলম্বিত করেছে।

এই তো গেল ব্রিটিশ-সৃষ্ট তথাকথিত নতুন মধ্যশ্রেণীর হাল।

বঙ্কিমচন্দ্র "বাংলার কৃষক" নিবন্ধে এদের চরিত্রটি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন: '১৭৯৪ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" ভবিষ্যতে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তারা হয় জমিদার, না হয় ভূমির সঙ্গে যুক্ত মধ্যস্বত্বভোগী এবং তারি আশ্রিত মানুষগুলো, তারাই নগরকেন্দ্রিক ইংরাজি উচ্চশিক্ষার সুফল গ্রহণ করে সরকারি অথবা সওদাগিরি আপিসের আমলা নিযুক্ত হল। এবং স্বাভাবিক কারণে এই শ্রেণীর নিজস্ব চরিত্রে জমি-দারির বিরুদ্ধে কোনো বক্তব্য শোনা গেলনা। বঙ্কিমের কথায়, তাহলে "বঙ্গসমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।"

লক্ষ্য করবার বিষয় ইংরাজ সিভিলিয়ান উদ্যোগে এদেশে জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হবার পর থেকে বিদেশী সরকারের কাছ থেকে যা কিছু দাবিদাওয়া আদায়ের চেষ্টা হয়েছে, এই মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বের কারণেই কোনোদিন জমিদারি উচ্ছেদের দাবি উত্থিত হয়নি।

মধ্যশ্রেণীর এই চরিত্রের যাথার্থ্য যদি আমরা স্বীকার করে নিতে পারি তাহলে দ্বিতীয় প্রিয় প্রসঙ্গটি আলোচনা করা যেতে পারে। সেটা হচ্ছে ইংরাজ আমাদের "জাতীয়তাবাদে" দীক্ষিত করেছে। ইংরাজের কাছ থেকে আমরা পেট্রিয়টিজম্ শিখেছি, ইংরাজরা আমাদের 'বিশ্বমুখীন' করেছে, ইংরাজ আসার আগে 'ইতিহাস' কী করে লিখতে হয় আমরা জানতাম না, ইত্যাকার নানান গবেষণা এদেশে চাউর করেছে বৃহত্তর দেশের মানুষের

সঙ্গে সম্পর্করহিত শিকড়হীন ইংরাজি শিক্ষিত এই মধ্যশ্রেণী, যাদের হাতে আটকানো ছিল আমাদের রাজনীতি।

কথাটা রাজনীতি শোনালেও সত্য। শহুরে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যে রাজনীতির উত্তরাধিকার আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তাতে স্বদেশ এবং জাতিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতাকে বুদ্ধিমানের মতো এড়াতে গিয়ে তাঁরা হুবহু ইংরাজের রাজনীতিকে এদেশে আক্ষরিক তর্জমা করে দিয়ে দায় চুকিয়েছেন। 'নেশন' অর্থে ইংরাজ যা বোঝে, ভারতবর্ষ কোনো কালে ঐতিহাসিক ভাবেও তা ছিল না। জাতিগত বৈচিত্র্যই এদেশের ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্য। ভারত বলে কোনো নেশন কোনো কালেই ছিল না। বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত বিচিত্র এই দেশ, এই জাতিগত বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েই এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। উদার হিন্দুধর্ম জাতিগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সূক্ষ্মভাবে মিলনের সূত্র রক্ষা করে চলেছে। এবং সচরাচর যাকে 'ভারতীয় সংস্কৃতি' বলে উল্লেখ করা হয় তারও প্রেরণা 'হিন্দু সংস্কৃতি'। সচেতন পাঠক "হিন্দু" শব্দটিকে যেন সাম্প্রদায়িক অর্থে গ্রহণ না করেন, এই অনুরোধ।

দেশজ প্রকৃতি সম্পর্কে ইতিহাসবোধের অভাবে ইংরাজি-শিক্ষিত আমাদের মধ্যশ্রেণীর নেতৃবর্গ যে গোঁজামিল সৃষ্টি করেছেন তাতে আমাদের ইতিহাসই সঠিক আদল না পেয়ে কখনো পশ্চিমী কখনো প্রাচ্যের মিশেলে এমন কিম্ভূত হয়ে উঠেছে যে প্রকৃত স্বরূপটাকে চেনাই যাচ্ছেনা।

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থেই ব্রিটিশের পক্ষে এক-শাসনে দেশকে আনার প্রয়োজন হয়েছিল, পরোক্ষতও 'নেশন' গড়বার জন্যে নয় নিজস্ব জাতি বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বাঙালী গুজরাতি কী শিখ কারুরই পক্ষে পরাধীনতার জ্বালা বুঝতে কোনো অসুবিধে হয়নি। রামায়ণের কাহিনীর রস বুঝতে উত্তর ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতেরও কোনো বাধা সৃষ্টি হয়নি। মুখ্যত একজন বাঙালী কৃষক বা শ্রমিকের সঙ্গে বম্বে বা কেরলের কৃষক শ্রমিকের শ্রেণীগত চরিত্রের তফাত নেই। এই 'জাতীয়তাবোধ' ছিল অনেকটা ধোঁয়াটে ধরনের। যেন কেবলমাত্র ব্রিটিশের উচ্ছেদেই এর সীমানা। অথচ দেশের বৃহত্তর মানুষ অদৃশ্য দেবতার মতোই সবসময় যে ব্রিটিশ-শত্রুকে বুঝেছে তা নয়। চাষির কাছে ভূস্বামী, মহাজন, কী মধ্যস্বত্ব ভোগীর শোষণের ব্যাপারটাই ছিল প্রত্যক্ষ সত্য, যে কারণে তথাকথিত জাতীয়তাবোধের অভাবেও

এদেশের কৃষক বহুবার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

অথচ যে মধ্যশ্রেণী এদেশে রাজনীতি পরিচালনা করেছেন তাঁদের ইংরাজি ধারণাপুষ্ট জাতীয়তাবোধের সঙ্গে প্রকৃত দেশের সমস্যার কোনো যোগ ছিলনা। তাঁরা উপর-উপর এদেশে শাসনকার্যের ব্যাপারে ইংরাজের পরিবর্তে নিজেদের প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছিলেন। আমাদের দেশ আমরাই শাসন করব—এই ছিল লক্ষ্য। বিষয়টা সহজ মনে করলেও সহজে যে মেটেনা এটাও গভীর ভাবে উপলব্ধি করার দরকার। বিদেশী ইংরাজ এদেশের সত্যকার অবস্থাটা বোঝবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে তাদের দেশের নিজস্ব পার্লামেণ্টারি শাসন পদ্ধতি, বিচারশালা, আইন, শিক্ষার সংস্কারগুলো আমাদের কাঁধে থাবড়া মেরে বসিয়ে দিয়েছে। পাইকারী অশিক্ষা আর দারিদ্র্যের দেশে এই বিলাসগুলি ক'জন মানুষের পক্ষে উপযোগী ছিল, আজ তা চোখ বুজেও বলে দেয়া যেতে পারে। ইংরাজ-সৃষ্ট শহুরে মধ্যশ্রেণী, ইতিহাসের নিয়মে ভবিষ্যতে যাঁরা এদেশের শাসক-শ্রেণীতে উন্নীত হবেন এবং যাঁরা সাম্রাজ্য-বাদী চরিত্রের অতিরিক্ত ইংরাজের চিত্তের ঔদার্যকে ভালোবেসে ফেলেছেন, তাঁরা যে ইংরাজের সুযোগ্য উত্তরসাধক হবেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও তাৎপর্য

বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিচার না করলে আসল সমাজ-ইতিহাসটাকেই আমরা ধরতে পারব না। কারণ এই ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বাঙালী মধ্যশ্রেণীর যাবতীয় ধ্যান-ধারণা বহুকাল ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই কথাটা স্বীকার করলে অন্যায় হবে না যে, এই গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ থাকার কারণেই আমাদের বুদ্ধিজীবীশ্রেণী ভবিষ্যত সমাজ-নির্মাণে প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করতে অক্ষম হয়েছেন। যদিও সমাজ-ঐতিহাসিকগণ মূল প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে মনীষীদের ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা-সংস্কারকে বড় করে দেখে তাঁদের ভূমিকাকে উজ্জ্বল করে চিত্রিত করতে ভালোবেসেছেন। প্রশ্নটা জাগতে পারে অন্তত ঐতিহাসিকগণও ভূস্বামীদের স্বার্থের বাইরে সমাজ-পর্যবেক্ষণ করবার নির্ভুল শক্তিটাকে আয়ত্ত করতে পারলেন না কেন? উত্তর একটিই। এই ঐতিহাসিকদের চেতনাও ভূ-স্বামীদের স্বার্থের বাইরে ছিল না। কারণ এই সমস্ত ঐতিহাসিক শহুরে ইংরাজি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীরই অংশ, যাঁরা পাকেচক্রে জমিদারি স্বার্থের সঙ্গে জড়িত।

এখন কথা হচ্ছে জমিদারি ব্যবস্থার প্রশ্নটিকে মুলতুবী রেখে অন্য কোনো ক্ষেত্রেও কী প্রগতিশীল ভূমিকা নেয়া যায় না? আমাদের বিচারে, না।

কারণ, সর্বপ্রথম এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমেই ইংরাজ রাজত্বের নাম করে এ দেশে ঔপনিবেশিক শোষণকে আইনসঙ্গত করল। এবং জমি-রাজস্বই ছিল এ দেশে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন, যার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ভাবে ধ্বংস করা হল আমাদের স্বয়ম্ভূ পল্লীকেন্দ্রিক কুটির শিল্পাশ্রয়ী অর্থনীতিকে। 'কুটির শিল্প' পদ্ধতিকে যেন আমরা ছোটো করে না দেখি। কারণ একে কেন্দ্র করে, আমাদের গড়ে উঠেছিল বিশ্বব্যাপী উন্নত ব্যবসা বাণিজ্য। প্রধানত আরব বণিকদের মাধ্যমে এই সরবরাহ পৌঁছেছিল বহির্ভারতের ক্রেতাদের কাছে। কৃষির সঙ্গে এই কুটির শিল্পের স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিল। সারা বছর কুটির শিল্পে বা কৃষিতে কাজ থাকার জন্যে কর্মহীন বেকারের সংখ্যা তেমন প্রবল ছিল না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইংরাজ আমাদের কুটির শিল্পকে ধ্বংস করল। এমন কি যে সব ভারতীয় বেনিয়া শিল্পে লগ্নি করে স্বাধীন ব্যবসা করছিল তাদের প্রতিপত্তিও নষ্ট করা হল। ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যে ভারতীয় প্রতিযোগিতাকে বন্ধ করবার জন্যে এদেশের বেনিয়াদের একমাত্র জমিতে লগ্নি করতে বাধ্য করা হল। কৃষি-রাজস্ব কাঁচা পয়সায় আদায় দেবার প্রথা চালু হওয়ার সঙ্গে কৃষি ব্যবস্থায় নতুন মহাজন শ্রেণী গড়ে উঠল। তারা একই জমিদারী শ্রেণী থেকে উদ্ভূত অথবা নতুন অংশ গ্রহণ-কারী। জমিদারী ও মহাজন সিন্ধবাদের ভূতের মতো রায়তের কাঁধে জাঁকিয়ে বসল। এ দেশের বৃহত্তর শ্রেণী হচ্ছে কৃষক, জমিদার বা মহাজন নয়, কাজেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নটি খাতিয়ে দেখতে গেলে আমাদের কৃষকদের অবস্থার প্রতিই দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে হবে।

ফলত, যে-চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এ দেশের অর্থনৈতিক প্যাটার্নটাকেই বদলে দিল, এবং যার সঙ্গে এ দেশের বৃহত্তর মানুষের স্বার্থ জড়িত, সে-প্রশ্নটির পক্ষে বা বিপক্ষে কারা আছেন, তার উপরই নির্ভর করবে প্রগতি-প্রতিক্রিয়ার চারিত্র্য। এবং সে কারণে যদি মনীষীদের পুনর্মূল্যায়ণের ঐতিহাসিক কর্তব্য আসে, তাহলে তা উপেক্ষা করলে সংখ্যাগুরু মানুষের মঙ্গল হবে না।

অথচ, আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবি দাওয়ার মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো বিষয়টি স্থান পায়নি। পরবর্তীকালে, বিশ শত-কের ত্রিশের দশকে যখন এ নিয়ে আলোচনা হল তখন জমিদারকে ক্ষতিপূরণ দেবার প্রস্তাবটাও যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।

আগের কথায় ফিরে আসা যাক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে দেশের অবস্থাটা বিচার করে দেখা যাক। এই প্রসঙ্গে বলে নেয়া দরকার যে ভারতীয় জমিদারদের মতো ১৮৩৩-এর চার্টার আইন অনুযায়ী য়ুরোপীয়দেরও জমির স্বত্ব দেয়া হল, যার ফলে সাহেবদের মালিকানায় বাগিচা গড়ে উঠল। ভারতীয় জমিদার ও সাহেব বাগিচা মালিকদের সুলভে বিত্তশালী হবার অমানুষিক লালসায় ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ এই পনেরো বছর বাদ দিলে ১৮৬৬ থেকে ১৯০০-এর মধ্যে ক্রমান্বয়ে পাঁচ বছর অন্তর দুর্ভিক্ষের অভিশাপ লেগেই ছিল। মধ্যযুগের বর্বরতার হাত থেকে ত্রাণকর্তা হিসাবে ইংরাজ রাজত্বের গুণগ্রাহীর সংখ্যা এ দেশে এখনো কম নয়, তাঁরা অনুগ্রহ করে বিষয়টা নতুন করে ভেবে দেখতে পারেন! এই

জাতীয় পঞ্চবার্ষিক দুর্ভিক্ষ নিরোধ কল্পে সেচ ব্যবস্থার প্রতি যে গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল তার পরিবর্তে দূরবর্তী বাজার কব্জা করতে ইংরাজ বণিকস্বার্থে রেলপথ খোলাই অগ্রাধিকার গেল।

কথাটা মেনে নেয়াই ভালো যে ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির দিকে ইংরাজের লক্ষ্য ছিল না। দারিদ্র্য আর হতাশার দীর্ঘশ্বাসে ব্রিটিশ শাসন এদেশে ভারি হয়ে উঠেছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এদেশে চিরস্থায়ী দুর্ভিক্ষেরই নামান্তর। অথচ বেশির ভাগ রাজস্ব আদায় হত এই জমিদারি এলাকা থেকেই। তদানীন্তন ভারতের রাজ্য সচিব লর্ড স্যালিসবারিকেও মন্তব্য করতে হয়,

"It is not in itselt a thirttv policy to draw the mass of revenue from the rural districts, where capital is scarce, sparing the towns where it is redundant and runs to waste in luxury."

তিনি আরো বললেন,

"As India must be bled, the lancet should be directed to the parts where the blood is congested, or at least sufficient, not to those which are already feeble from the want of it".

সাম্রাজ্য-স্বার্থবাহী একজন বিদেশীর চোখে সেদিন যে মর্মান্তিক চিত্রটি ধরা পড়েছিল আমাদের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা শ্রেণীগত স্বার্থেই সে-সম্পর্কে নিশ্চুপ। অথচ বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের প্রশ্নে আজকের সচেতন মানুষের নীরব থাকা অমার্জনীয় অপরাধ। বিষয়টির পুনর্বিচারে প্রচলিত চিন্তাধারায় আঘাত লাগলেও ঐতিহাসিক সত্যে আমাদের পৌছতেই হবে সূর্য পূর্ব দিকে উঠবেই—এটাই যদি নিয়ম হয় তাহলে সে কালের মনীষীদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার নিয়মটিকেও মেনে নিতে হবে। কারণ এটাও এক ঐতিহাসিক সত্য।

অন্যদিকে শ্রেণীগত স্বার্থেই এ দেশের কৃষক শ্রেণী জমিদারি-রূপ শোষণকে মেনে নিতে পারিনি। এটাও সমান সত্য। কাজেই এই কৃষক বিক্ষোভের দলিলগুলিও সকলের সমক্ষে তুলে ধরার প্রয়োজন।

১৮৬২-এর প্রত্যুষে মীর কাসিম ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর এক অংশ সিপাহীকে সমবেত করে ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। দু'শতাব্দী ধরে বাঙলা দেশের কৃষকশ্রেণী ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বস্তুত

আঠারো ও উনিশ শতকের ব্রিটিশ বিরোধী লড়ায়ের প্রধান প্রেরণাই হচ্ছে কৃষকশ্রেণী। ১৭৮৩ রংপুরে, ১৭৮৯ বিষ্ণুপুরে, ১৭৯৫-৯৯ মেদিনীপুর-বাঁকুড়া-মানভূমে চুয়ার বিদ্রোহ, ১৭৭০-১৭৯০ সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, ১৮৩১ বারাসাতে তিতু মীরের বিদ্রোহ, ১৮৩৮-৪৭ ফরিদপুরে ফেরাজী বিদ্রোহ, ১৮৫৫ সাঁওতাল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮৫৭-৮০ বাঙলা দেশে নীল বিদ্রোহ, ১৮৭৩ পাবনা বিদ্রোহ—এ দেশে কৃষক অভ্যুত্থানের রক্তরাঙা ইতিহাস

পাবনা কৃষক বিদ্রোহের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি আজকের অচেতন পাঠকদের সামনে রাখার প্রয়োজন বোধ করছি।

নাটোরের রাজার দখলে পাবনা পরগণা ভাগ হয়ে গেলে এই পাঁচজন জমিদারি খরিদ করেন। এক, কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, দুই, ঢাকার ব্যানার্জিরা, তিন, সালোপের সান্যালরা, চার, সাথালের পাকড়াশিরা, পাঁচ, পর্জনার ভাদুড়িরা।

এই "জমিদার"-গোষ্ঠী বেআইনী করের জুলুমে কৃষকদের রক্তাক্ত করে দিলে প্রধানত মুসলমান প্রজারা পাবনা কৃষি লীগ নামে একটি দৃঢ় সংগঠন গড়ে তোলেন। নেতৃত্ব করেন দুজন হিন্দু ঈশানচন্দ্র রায় ও শম্ভুনাথ পাল। কৃষকদের সংঘবদ্ধ আন্দোলন এমন তীব্র হয়ে ওঠে যে, সরকারকে বাধ্য হয়ে তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করতে হয়। সরকার যাতে প্রজাদের স্বার্থে কোনো আইন প্রণয়ন করতে না পারে তার জন্যে এই জমিদার চক্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরদের নেতৃত্বে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে তীব্র বিরোধিতা করে অভিমত প্রকাশ করে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী জমিদারের অধিকারকে কোনো মতে লঙ্ঘন করা চলবে না। জমিদারের মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট, অমৃত বাজার পত্রিকা, হালিশহর পত্রিকা জমিদারের স্বার্থে বিষোদ্গার ছড়াতে লাগল এই বলে যে কৃষকদের এই "লীগ" আসলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার নজির, যার অজুহাতে এরা "হিন্দু" প্রতিবেশীদের ঘর লুঠ করছে, আগুন জ্বালাচ্ছে, ইত্যাদি। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের সমবেত চাপ সত্ত্বেও সরকার ১৮৮৫-এর "বেঙ্গল টেন্যানসি অ্যাক্টে" প্রজাদের স্বার্থ কিছুটা রক্ষা করে জমিদারের স্বৈরাচার থেকে প্রজাদের স্বস্তি দেন।

"কাঙাল হরিনাথের ডায়েরি" এ বিষয়ে আরো কিছু আলোকপাত করতে পারে। উল্লেখ্য সুরেন বাঁড়ুজ্যে পাবনা প্রজাদের আন্দোলন সমর্থন করেন

এই হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং তার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী-স্বার্থ। যেহেতু সত্য নিরপেক্ষ নয়, পারস্পরিক, সেহেতু সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ত-প্রভু অন্যদিকে কৃষকের স্বার্থ, সবই শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গিতে বিপরীত হলেও অবশ্যই শ্রেণীগত সত্য। এই শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনো বিষয়ই মুক্ত হতে পারে না।

ফলত, উনিশ শতকের প্রধান বাঙালী বুদ্ধিজীবী রামমোহন, দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখের বিচারে তাঁদের পিছনের জমিদারির চালচিত্রটিকে বর্জন করা যায় না। তাঁরা যে জমিদারি স্বার্থকে বজায় রাখবেন এইটেই তাঁদের শ্রেণীগত সত্য। এঁরাও কখনো কখনো এই ব্যবস্থার শিকার কৃষকদের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে সহানুভূতি জানিয়েছেন বটে, কিন্তু মূল সমস্যার গভীরে স্বাভাবিক কারণে প্রবেশ করেননি।

এখন দেখা যাক সে যুগে এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পাওয়া যায় কিনা।

"ইয়ং বেঙ্গলের" অন্যতম প্রধান নেতা দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে নাকচ করে ঘোষণা করেন যে হিন্দু ও মুসলিম শাসনে "the right in the soil was in private individuals, and that it was a great mistake to have converted the Zaminders, who were the collectors of revenue into proprietors of landed estates, by which act the rights of a vast number have been sacrificed"

১৮৫৯-এ নীল বিদ্রোহে হরিশ্চন্দ্র মুখার্জি স্পষ্টতই কৃষকদের স্বার্থ অবলম্বন করেন।

দীনবন্ধু মিত্রের "নীল দর্পণ" ও মুশারফ হোসেনের "জমিদার দর্পণ" একই সহানুভূতি বহন করছে।

অভয়চরণ দাসের "ভারতীয় রায়ত" (১৮৮১) গ্রন্থটি এই প্রতিবাদী ধারার সোচ্চার রচনা। সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, অভয়চরণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে খারিজ করে কৃষকের হাতে জমির স্বত্ব দেবার জন্যে ওকালতি করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলোপে জমিদারদের স্বার্থহানির প্রশ্নে ক্ষতিপূরণের কথা উঠলে তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, জমিদারদের সঙ্গে এই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত মানুষদেরও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেহেতু বছরের পর বছর এরাও বৈষম্যমূলক করভারে উৎপীড়িত হয়েছে। কৃষক-বিদ্রোহকে সমর্থন করে সেকালে অভয়চরণই বলতে পারেন,

"Is it possible for men to hold up their hands......and thus pave the way to starvation, when we see the lower animals form combinations among themselves to withstand the attack of the enemies? Certainly not. Their very conscience—we may say their very human nature—points out to them the combination as the only means...Our readers may think, that we are hereby encouraging the ryots to resort to violence, No. We are far from doing that, we are only saying that men in general are very much disposed to take the law into their hands, when they see the Courts of justice virtually shut up against them."

উনিশ শতক থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্নে দুটো বিপরীত ভাবধারা চলে এসেছে। সংখ্যায় কম হলেও বিরুদ্ধবাদীরা আজকের সচেতন পাঠকের কাছে অধিক শ্রদ্ধার যোগ্য। এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর অংশটি চিরকালই এ দেশে প্রতিক্রিয়াশীল ঐতিহ্যের তুলনায় দুর্বল এ সত্যও মেনে নেয়া ভালো। তা না হলে উনিশ শতক থেকে বিশ শতক পর্যন্ত প্রগতিশীল শক্তি এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের নিয়ামক হতে পারত।

দুঃখ করে লাভ নেই, এই অন্যায় প্রথার উপর আমাদের সুপারস্ট্রাকচার গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে দীর্ঘ সহবাস যেমন আচারে-মননে আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ গ্রাস করেছে তেমনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশ্রয়ে উক্ত প্রভাবশালী শ্রেণীর দর্শন মধ্যশ্রেণীকে দুরারোগ্য ব্যাধির মতো জর্জরিত করে রেখেছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইংরাজ শাসকের সহযোগী একটি মধ্যশ্রেণীই তৈরি করল না শুধু, তার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া কি ভাবে আমাদের রাজনীতি, সংস্কৃতি সাহিত্যশিল্প তাবৎ উপরিতলকে জয় করে নিল, সে বৃহত্তর ঘটনাটাও স্মরণ করতে হবে। উনিশ শতকে কোনো বুর্জোয়া রেনেশাঁস আমাদের দেশে হয়নি, সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোকে আঁকড়ে ধরে' আধুনিকতার নাম করে' ইংরেজিয়ানাকে অন্ধের মতো নকল করেছি। তথাকথিত রেনেশাঁসওয়ালারা নিজেদের সাহেবদের জুনিয়ার পার্টনার হিসেবে ভেবে এমন সব সংস্কার নিয়ে মাথাব্যথা শুরু করলেন যেগুলো খোদ 'ব্রিটিশ প্রজার' কাজ।

অর্থাৎ ধরে নেয়া হল ইংরাজ-শাসন ঈশ্বরের অভিপ্রেত এবং নেটিভদের পরম সৌভাগ্য যে ইংরাজকে প্রভু হিসেবে পেয়েছে। এই ধারণা থেকে মূল ইংলণ্ডে বসে সেখানকার প্রজা যে সব সংস্কার নিয়ে সেদিন মাথা ঘামিয়েছে এখানকার প্রজারাও তারই অনুকরণ করতে শুরু করলেন। আসল কথা ইংরাজ প্রজার দৃষ্টিভঙ্গিতেই এদেশে 'নেটিভ প্রজা' সমস্যাগুলোকে ধরতে চেষ্টা করলেন। এ দেশটা যে একটা কলোনি এবং এখানকার মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে ইংরাজ সরকারের যে তারতম্য থাকাই স্বাভাবিক, এই মোদ্দা প্রশ্নটাই ভুলে যেতে ভালোবাসলাম আমরা।

বলা বাহুল্য ইংরেজ-শাসক মনেপ্রাণে এমনি একটি মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবী গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তার উদ্দেশ্য সফলও হয়েছিল বলতেই হবে। যেমন করে এই বুদ্ধিজীবীর মনোযোগ সাম্রাজ্যবাদ থেকে সরে গিয়েছিল তেমনি তাঁরা স্বস্বার্থে জড়িত থাকার কারণে তো বটেই, অধিকন্তু তাঁদের আশ্রিত বিশেষত শিক্ষিত শ্রেণীর দৃষ্টি থেকে জমিদারি ব্যাপারটার শ্রেণীচরিত্রটি আড়াল পড়ে গিয়েছিল। ঘষা পয়সা যেমন করে বাজারে চালু হয়ে যায় তেমনি জমিদারির মতো একটা গর্হিত ব্যবস্থা সমাজে দিব্যি অচল হয়ে গেল। এই ব্যবস্থা দ্বারা যাঁরা উপকৃত তাঁরা তো বটেই, এমনকি যাঁরা এ দ্বারা শোষিত তাঁদেরও ভোলাবার ব্যবস্থা হল। দিনগতে শোষিত কৃষকটিও একদা এই ধাঁধাটা আবিষ্কার করতে পারল না যাঁর সঙ্গে জমির শারীরিক কোনো সম্পর্কই নেই তিনি কোন্ অধিকারে তার সম্পদ দাবি করেন? ক্রমে সূর্য যেমন সত্য জমিদারও তেমনি সত্য হয়ে উঠলেন। চাষির দুরবস্থার জন্য কোনো জমিদারই দায়ি নন, দায়ি তার কর্মফল, তার অদৃষ্ট। একযোগে ঢ্যাড়া পেটানো হল পল্লীর যা কিছু উন্নতি জমিদারের জন্যই। 'সৎ' জমিদাররা গ্রামে ইস্কুল খুলেছে, ডাকঘর খুলেছে, দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছে, জমিদারের উদারতায় গ্রামে 'শুভ উৎসব' হয়, প্রজা-নির্বিশেষে সকলের সেখানে নিমন্ত্রণ।

কাজে কাজেই জমিদারি থাকাটা জরুরী, গ্রামের সার্বিক উন্নতির জন্যে। 'অসৎ জমিদার' গ্রামের সর্বনাশের কারণ।

একটা 'অসাধু' ব্যবস্থাকে এই ভাবেই গোবর জল ছিটিয়ে শুদ্ধ করে নেবার আয়োজন।

চাষি যদি সচেতন হতেন তবে বুঝতে পারতেন 'সৎ' জমিদারের তথাকথিত

ভালো কাজগুলির খরচনির্বাহ প্রজাদের উপর আইনী-বেআইনী আদায়ের দ্বারাই সাধিত। জমিদার যেমন পারতপক্ষে জমির জন্যে এক কার্দিংও খরচ করেন না তেমনি গ্রামের ভালো কাজগুলির খরচও তিনি বহন করেন না। খরচ আসে প্রজাদের কাছ থেকেই কোনো না কোনো প্রকারে।

এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর প্রচারে যেমন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদকে আড়াল করে' ইংরাজের চিত্তপ্রসারের কথা বলা হয়, এমন কি কেউ কেউ 'ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ' ভাবতেও ভালোবাসেন তেমনি 'সৎ' 'অসৎ' জমিদারের কথাও প্রচার করা হয়। অথচ সমাজ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করবেন যে তাবৎ জমিদারি ব্যবস্থাই অন্যায়ের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, শোষণই যার মূল কথা, সেখানে সৎ-অসতের কোনো প্রশ্নই নেই। সেই জমিদার মহাত্মাই হোন কী মহর্ষিই হোন্, চেহারাটা একই। ব্যাপারটা চরমে দাঁড়ায় যখন ইস্কুলে-পাঠ্য কেতাবে 'পুণ্যাহে' রবীন্দ্রনাথ কেমন আভিজাত্যের বেড়া ডিঙিয়ে প্রজাদের সঙ্গে এক আসনে বসে জমিদারের আদর্শ নিদর্শন রেখেছিলেন বলে' গুণকীর্তন করা হয়। আসলে এই পুণ্যদিন কার? খাজনা আদায়ের এই মহরৎ নিশ্চয়ই দুঃস্থ প্রজার কাছে আনন্দের দিন নয়! রবীন্দ্রনাথ যদি এই 'পুণ্যাহ' ব্যাপারটাই তুলে দিতে পারতেন তাহলেই তাঁর পক্ষে সত্যিকার আদর্শ কাজ হত। এই পুণ্যাহের আদায়টাও যথেষ্ট আইনসঙ্গত ব্যাপার বলে' ধরা যায় না। আইনের বাইরে জমিদার যে কত কৌশলে বেআইনী আদায় করেছে ইতিহাস তার সাক্ষী। পাবনার জলন্ত কৃষক-বিদ্রোহ তার প্রমাণ। মহর্ষি জমিদার দেবেন্দ্রনাথ যার সঙ্গে যুক্ত।

রাষ্ট্র, ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ, জমিদারের এই চিরস্থায়ী অধিকারকে স্বাভাবিক বলে গণ্য করল। এবং তাবৎ মানুষকে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত করল। দীর্ঘ দুই শতাব্দী এই প্রধান বিষয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠল না। জমিদারি আশ্রয় করেও মনীষীগণ 'ভারত পথিক' মহাত্মা, আদরের 'প্রিন্স', 'মহর্ষি' ইত্যাকার উজ্জল বিশেষণে ভূষিত হয়ে উঠলেন। ভূস্বামী ও তাঁর আশ্রিত সমাজ-ব্যাখ্যাতারা এই কিম্বদন্তীকে সইয়ে দিলেন।

একটা প্রকাণ্ড মিথ্যাকে ঢাকতে গিয়ে সেদিন থেকে মধ্যশ্রেণী যে দু মুখো নীতি গ্রহণ করলেন তার ফলে আমাদের সামাজিক ইতিহাস অর্ধসত্য বা অর্ধ মিথ্যায় ঘুলিয়ে উঠল।

জমিদারের শ্রেণীদর্শন ব্যাপক জনগণের দিক্‌নির্দেশ হয়ে উঠল।

জনগণের কাছে প্রভাবশালী হাতিয়ার হিসেবে সাহিত্য এই শ্রেণীর তল্পি বহন করতে এগিয়ে এল।

বঙ্কিমচন্দ্র তার ভগীরথ। মাইকেলের ঐশ্বর্যবান্ কবিত্ব ব্যাপক পাঠককে অভিভূত করতে পারেনি। 'বাংলার কৃষক' শীর্ষক নিবন্ধে বঙ্কিমের কৃষক সমাজ সম্পর্কে আশ্চর্য বস্তুবাদী উদ্‌ঘাটন থাকা সত্ত্বেও শ্রেণী-আনুগত্যকে তিনি পরিহার করতে পারলেন না। সামাজিক উপন্যাসে তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি জমিদার, কিন্তু শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি। কৃষ্ণকান্ত, গোবিন্দলাল, নগেন্দ্র—তাঁদের কারুর সঙ্গেই কৃষকের স্বার্থের দ্বন্দ্ব নেই। কারণ তাঁদের 'চরিত্র' হিসেবেই ভাবা যায়, জমিদার না হলেও ক্ষতি নেই। এই প্রসঙ্গে 'নীল দর্পণ' বা 'জমিদার দর্পণ' সম্পর্কে বঙ্কিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্মর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত 'ভালো জমিদার' 'মন্দ জমিদার'-রূপ থিসিসে তাঁর অপূর্ব দূরদৃষ্টিকে বন্ধক দিয়েছেন। এবং একই শ্রেণীস্বার্থে এ দেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের জয়ধ্বনি করেছেন।

এক বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করলেই তদানীন্তন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর চরিত্রের এই দোটানা আবিষ্কার করা যায়। যিনি 'বাংলার কৃষক' লেখেন, যিনি কমলাকান্তের দপ্তরের তীক্ষ্ণ সরস বর্ণনায় লোক চরিত্র-সহ 'বিড়ালের' মাধ্যমে 'সমাজতন্ত্রের' আদর্শের আশ্চর্য বিশ্লেষণ করেন তিনিও শ্রেণীদায়িত্বে 'বিপ্লবের অনুমোদক' হতে পারেন না। একেক সময় মনে হয় বঙ্কিম আত্মদর্শন করছেন। সে যুগে বঙ্কিম এ বিষয়ে সচেতন, জ্ঞানপাপী বললেও ভুল বলা হয় না।

গল্পে আছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর গলার মালা রবীন্দ্রনাথকে পরিয়ে দিয়ে সাহিত্যে কবিকেই তাঁর যোগ্যতম উত্তরাধিকারী মনোনয়ন ক'রে গেছেন। গল্পের সত্য-মিথ্যা যাই থাক না, এটাকে প্রতীক হিসেবে নেয়া যেতে পারে। শ্রেণীগত স্বার্থেই বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে মনোনয়ন করবেন, এইটেই স্বাভাবিক। পিতৃপিতামহসূত্রে প্রাপ্ত জমিদার পরিচয়কে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন। পিতা দেবেন্দ্রনাথ অন্যান্য পুত্রের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের জমিদারি পরিচালনার প্রতিভাকে তারিফ করেছেন। খাজনা আদায় করতে রবীন্দ্রনাথ মহলে মহলে ঘুরেছেন, যা নাকি গ্রাম্যপ্রকৃতি ও মানুষ সহযোগে তাঁর চেতনায় প্রকৃতি ও মানবপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল। জমিদারি ও কবিসত্তার মধ্যে কোনো বিরোধ না ঘটিয়ে অদ্ভুত সুসমঞ্জস করেছিল তাঁর

মনোভঙ্গিকে। ‘সৎ’ জমিদারের দানে গ্রামের উন্নতির থিয়োরি কবির মনেও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। জমিদার ও প্রজা দুইই স্বাভাবিক নিয়মের ফল, রবীন্দ্রনাথ দুইয়ের মধ্যে শ্রেণীগত বিরোধের সত্যকে অস্বীকার করেছেন। বরং যাঁরা সরল, নিরীহ প্রজাদের উসকানি দিচ্ছেন তাঁদের সম্পর্কে ‘রায়তের কথা’ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি তীব্র মন্তব্য করেছেন “ইদানিং পশ্চিমে বলসেভিজম্, ফাসিজম্ প্রভৃতি যে সব উদ্‌যোগ দেখা দিয়েছে আমরা যে তার কার্যকারণ, তার আকারপ্রকার সুস্পষ্ট বুঝি তা নয়; কেবল মোটের উপর বুঝেছি যে, গুণ্ডাতন্ত্রের আখড়া জমল।” বলে’ রায় দিলেন “রাশিয়ার জার-তন্ত্র ও বলসেভিক-তন্ত্র একই দানবের পাশ মোড়া দেওয়া।” রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করছেন “আমি জানি জমিদার জোঁক; সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।” স্বীকার করেও জমিদারি ছাড়ছেন না কেন? রবীন্দ্রনাথের যুক্তি: “প্রজাকে ছেড়ে দেব? তখন দেখতে দেখতে এক বড় জমিদারের জায়গায় দশ ছোটো জমিদার গজিয়ে উঠবে।···মূল কথাটা এই—রায়তের বুদ্ধি নেই, বিদ্যা নেই শক্তি নেই, আর ধনস্থানে শনি। তারা কোনো মতে নিজেকে রক্ষা করতে জানেনা। তাদের মধ্যে যারা জানে তাদের মতো ভয়ংকর জীব আর নেই। রায়ত খাদক রায়তের ক্ষুধা যে কত সর্বনেশে তার পরিচয় আমার জানা আছে তারা যে প্রণালীর ভিতর দিয়ে স্ফীত হতে হতে জমিদার হয়ে ওঠে, তার মধ্যে শয়তানের সকল শ্রেণীর অনুচরের জটলা দেখতে পাবে। জাল-জালিয়াতি, মিথ্যা-মকদ্দমা, ঘর-জ্বালানো, ফসল-তছনছ—কোনো বিভীষিকায় তাদের সংকোচ নেই।” দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, ভবিষ্যতের এই সব কথা ভেবে রবীন্দ্রনাথ রায়তের হাতে জমিদারি ছেড়ে দিতে রাজি নন্। এই ভূমিকাটির রচনাকাল ১৯২৬। যতদূর স্মরণ করতে পারছি, ১৯২৮-এ প্রজাদের স্বার্থে আইন পাশ করবার চেষ্টা হলে মুষ্টিমেয় মুসলমান সভ্য বাদ দিলে তাবৎ হিন্দু জমিদার ও বঙ্গীয় আইন সভার স্বরাজ্য পার্টির সভ্যরা প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি আমাদের পরবর্তী জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি বিষবৃক্ষ রোপণ করেছিল। যেহেতু এর সঙ্গে সংখ্যাগুরু মুসলমান কৃষকদের স্বার্থ জড়িত ছিল সেহেতু নেতাদের এই বিরুদ্ধাচরণকে তাঁরা সুনজরে দেখতে পারেননি। উত্তরকালে জাতীয় আন্দোলন থেকে বৃহত্তর মুসলমান সমাজের সরে যাওয়ার ইতিহাস এইভাবেই রচিত হয়েছিল। বৃহত্তর সমাজের মনে এই সন্দেহ, অবিশ্বাস,

ভবিষ্যতের সাম্প্রদায়িকতার রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ তথা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করতে তৎপর হয়ে উঠেছিল।

বিশাল রবীন্দ্র-রচনায় 'বিশ্বমুখীনতা' 'মানবতাবাদ' জাতীয় উচ্চ আদর্শের জয়গান রয়েছে, কিন্তু জমিদার-প্রজার খাদ্য-খাদকের বাস্তব সম্পর্কের বিশ্লেষণ নেই। 'দু' বিঘা জমি' কবিতায় জমিদারের শোষণকে তিনি "এ জগতে হায় সেই বেশি চায় যার আছে ভূরি ভূরি" জাতীয় দার্শনিকতার আলোকে দেখাতে চেয়েছেন। উৎপীড়িত 'উপেনের' মনস্তত্ত্বে তিনি নিজস্ব মানসিকতাকেই চাপিয়ে দিয়েছেন। যেন উপেনের সমস্যাটা 'সৎ' জমিদারের মহানুভবতার উপরই নির্ভর করছিল। 'অসৎ' জমিদারের দায়িত্ব তো রবীন্দ্রনাথ নিজের কাঁধে নিতে পারেন না! সততা বা অসততার উপরই কৃষকের ভালো-মন্দ নির্ভর করছে! 'সৎ' জমিদার রবীন্দ্রনাথকে এ-সমস্যা পীড়িত করেনি। তাই যে ফিউডালিজমের উপর জমিদারি-ব্যবস্থা টিকে রয়েছে রবীন্দ্র-রচনায় বার বার সেই পল্লী-প্রীতি, শহরের কল-কারখানা-লোহা-লক্কড়ের বাইরে, অহরহ হাতছানি দিয়ে ডাকছে। পল্লীপ্রকৃতির ছায়ায় গড়ে-ওঠা তাঁর শান্তিনিকেতনে প্রাচীন কালের তপোবনে ফিরে যাওয়ার আকুতি।

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গল্প-কবিতায় পল্লীজীবনের আবহ সৃষ্টি করেছে, কখনো সখনো চাষিজীবন উঁকি মেরেছে, কিন্তু কৃষক-জমিদারের মূল অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের চিত্র নেই। কারণ অর্থনীতিকে মানুষের সম্পর্কের নিয়ামক বলে রবীন্দ্রনাথ কখনো মনে করেননি। এক জাতীয় ভিক্টোরিয়ান হিউম্যানিজম দেশ-কাল-মানুষের উর্ধ্বে স্নেহজাতীয় পদার্থের মতো তাঁর সাহিত্য-কর্মকে রসসিক্ত করে রেখেছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, সক্রিয় রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলত, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কখনো তাঁর ব্যক্তিত্বে বা রচনায় দেখা যায়নি। তবু, এই রবীন্দ্রনাথই ১৯০৫-এ লর্ড কার্জনের গহিত বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদের আন্দোলনে শারীরিকভাবে অংশগ্রহণ ;করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই ভূমিকাও স্বল্পস্থায়ী। কারণ ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর কোনো কালেই উৎসাহ ছিল না। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়েই কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী-চরমপন্থীর বিভেদ সৃষ্টি হল, আত্মোৎসর্গে উদ্বুদ্ধ যে বিপ্লবী সমিতি গড়ে উঠল, সাম্রাজ্য-

বাদের পরিভাষায় যার নাম সন্ত্রাসবাদ, তার তাৎপর্যও রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করতে পারলেন না। তিনি অচিরে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী হলেন। অবশ্য ১৯১১ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হিসেবে ইংরাজ সন্তান রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে (পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী) না পাওয়া গেলেও রবীন্দ্রনাথ "জনগণমন অধিনায়ক" গানটি রচনা করে দিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ মেনে নেবার জন্যে অধিবেশন থেকে ইংরাজ সরকারকে ধন্যবাদও জ্ঞাপন করা হল।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এই বক্তব্য সূত্রহীন মনে হলেও সচেতন পাঠকদের বিষয়টি বুঝতে হবে! সেটা এই, বুদ্ধিজীবী শ্রেণী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন করলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত চরিত্রটিকে হয় তাঁরা ধরতে পারেননি অথবা সহযোগীর স্বার্থে সে বিষয়ে নিশ্চুপ। ছোটো ইংরেজ বড় ইংরেজ-রূপ থিসিসে ব্রিটিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা ব্রিটিশ-শাসকশ্রেণীর কাছেই দরবার করেছি। আগেই বলা হয়েছে এই শক্তিশালী বুদ্ধিজীবী সমাজের শ্রেণীদর্শন তাবৎ নাগরিক মধ্যশ্রেণীকেই আচ্ছন্ন করে রাখার ফলে আমাদের সাহিত্যের ঐতিহ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী তথা ভূস্বামীবিরোধী হতে পারেনি। এবং এই সাহিত্যই দীর্ঘকাল ধরে পাঠক-লেখক আনুকূল্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। সৌভাগ্যের কথা, এই সাহিত্যের ফলশ্রুতি সার্বিক নিরক্ষরতা ও নগর জীবন থেকে দূরে থাকা বৃহত্তর গ্রামীণ মানুষের আত্মীয়তা অর্জন করতে পারল না। বৃহত্তর মানুষ এই একপেশে সাহিত্যের আওতা থেকে নিরাপদ থাকল।

এই সাহিত্যকে কী "কলোনিয়াল সাহিত্য" বললে ভুল বলা হবে? অথচ আমেরিকা, যা একদা ইংলণ্ডের কলোনি ছিল, সেখানকার সাহিত্যের ঐতিহ্যও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায়, আত্মস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। আমাদের কেন এমন হল? উত্তর একই। আমাদের মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবীরা ইংরাজের শোষণে-শাসনে জুনিয়ার পার্টনারের সৌভাগ্যেই কৃতার্থ হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও পর্যন্ত বিশ্বাস করলেন "তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য ইউরোপের চিত্ত প্রতীকরূপে। মানুষ জোড়ে স্থান, চিত্ত জোড়ে মনকে। ইউরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে" ইত্যাদি। কাজেই রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি "ইউরোপীয় চরিত্রের প্রতি আস্থা নিয়েই আমাদের নবযুগের আরম্ভ হয়েছিল।" (কালান্তর, ১৯৩৩)।

সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের প্রতি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এই গুণগ্রাহিতাই এ দেশে ব্রিটিশকে দীর্ঘস্থায়ী করেছিল।

বিশ শতকের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দশকে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে পুষ্ট নাগরিক বুদ্ধিজীবী নিজস্ব একটি ভাবজগত তৈরি করবার প্রেরণায় এমন একটি আদর্শ খুঁজছিল যার প্রতীক হলেন রবীন্দ্রনাথ, যার নাম হল 'রাবীন্দ্রিক সংস্কৃতি', গৌরবে যার ব্যাপ্তি হল "রবীন্দ্রযুগে"। ক্রমাগত প্রচারে এই সত্য জল হাওয়া নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ স্বাভাবিক বলে' কীর্তিত হল এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হল রবীন্দ্রচর্চা মানেই বাঙালীর জীবনচর্চা !

সাহিত্য-ঐতিহ্যে ক্যাটল ও শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্র-সংস্কারে যখন শিক্ষিত নাগরিক বাঙালী স্থায়ী নিরাপত্তা ও আরাম বোধ করছেন তখন এই মধ্য শ্রেণীর নীচের স্তর থেকে যৌবন প্রায় উত্তীর্ণ করে রুগ্ণ শীর্ণ শরৎচন্দ্র দীর্ঘ কয়েক বৎসর প্রবাসে কাটিয়ে ১৯১৬-তে পাকাপাকি স্বদেশের সাহিত্য-বাতাবরণে অবতীর্ণ হলেন। কী ব্যক্তিগত জীবনে কী সাহিত্যাদর্শে রবীন্দ্র-চালচিত্রের বাঁধনে তাঁকে আটকানো গেলনা। প্রচলিত বিবাহ-সংস্কারকে সহজেই অস্বীকার করে তিনি জীবন সঙ্গিনী বেছে নিয়েছেন। বহির্ভারতে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে সংযোগ, বিশেষ করে নিঃস্ব, রিক্ত, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে মানুষের অসহায়তার পক্ষে শারীরিক-মানসিক-ভাবে দায়িত্ব গ্রহণ এই লেখককে তৎকালীন মূল দ্বন্দ্ব সম্পর্কে সচেতন করল। এতদিন সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা সামন্ততন্ত্রের পক্ষে যে দুর্বলতা গ্রাস করেছিল শিক্ষিত নাগরিক চরিত্রকে, এই লেখক যেন সচেতন ভাবে এই দুর্বলতাকে চূর্ণ করবার জন্যে তাঁর সৃষ্টিকে নিযুক্ত করলেন। লেখক এটা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলেন ঔপনিবেশিক জোয়াল কাঁধ থেকে নামিয়ে দিতে না পারলে সার্থক সাহিত্যের অনুকূলে উপযুক্ত মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবেনা। তাই দেশের বৃহত্তর মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের স্বার্থেই তিনি নিজের স্বার্থকেও যুক্ত করে নিলেন। সাহিত্যের ডেস্‌ক ছেড়ে তিনি নির্দ্বিধায় রাজপথে নেমে এলেন। আমরা দেখলাম তাঁকে কুখ্যাত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে ভলাণ্টিয়ারি করতে নেমে গেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেবার পবিত্র সংকল্পে হাওড়া কংগ্রেসের সভাপতি। দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছেন, সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী। কংগ্রেসের বিপ্লবী অংশ, অগ্নিযুগের বীরদের প্রতি, এমনকি এদেশে সোশ্যালিস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি কিংবদন্তী সৃষ্টি করেছে।

সে সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় কবি নজরুল ছাড়াও আরেক জন লেখকের উল্লেখ করা কর্তব্য হবে। তিনি শরৎচন্দ্র-অনুরাগী এবং সমদৃষ্টি-

সম্পন্ন, যাঁকে সাম্রাজ্যবাদের নিগ্রহেই "প্রেম চন্দ" ছদ্মনামটি গ্রহণ করতে হয়!

"পথের দাবী" সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বীভৎস মূর্তিটিকে যে ভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছে তা সে কালের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক কর্ম। শুধু সাম্রাজ্যবাদী শোষণই নয়, স্বাধীনতার আন্দোলনে নন্‌-ভায়োলেন্স বা ভায়োলেন্স কোনোটিতেই শরৎচন্দ্রের এলার্জি ছিল না, তাই কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং কংগ্রেসের ঘোষিত প্রধান নীতি "অহিংস" হলেও তিনি মুক্তকণ্ঠে বিপ্লববাদকে সমর্থন করেছেন। স্বাধীনতার আন্দোলনে শ্রমিকের ট্রেড ইউনিয়ন কর্মপ্রণালীকেও আন্দোলনের অংশবিশেষ বলে তিনি চিনিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার প্রশ্নটিই যখন আলোচিত হচ্ছে তখন ইংরেজি ভাষায় লিখিত হলেও মুলক্ রাজ আনন্দের 'কুলি' ও 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি'-শীর্ষক উপন্যাস দুটিকেও ঐতিহাসিক শর্তে মনে রাখতে হবে।

শরৎচন্দ্রই প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ রাখা যাক।

একটি ঘটনা সম্পর্কে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন বোধ করছি। রাজনীতির ব্যস্ত মানুষ স্বয়ং গান্ধীজি সে কালে তাঁর সেক্রেটারি শ্রীদেশাইকে নির্দেশ দেন, অবিলম্বে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী গুজরাতি ভাষায় তর্জমা করবার জন্যে। কারণটা কী এই নয় যে, গান্ধীজি শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকর্মের সঠিক ভূমিকাটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন?

পথের দাবীর কী ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেশব্যাপী শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ তৎকালীন কলকাতার পুলিশ কমিশনার কলসন্ স্বয়ং লেখককে, বলেছিলেন "শরৎবাবু, আপনি পথের দাবী লিখে আমাদের কী ক্ষতি করেছেন জানেন? আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি, সেখানেই দেখছি তাদের সকলের কাছেই একটি করে গীতা ও একটি করে পথের দাবী। আপনার পথের দাবী বিপ্লবীদের কী ভাবে মাতিয়েছে একবার দেখুন।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শ্রেণীগত দুর্বলতায় পথের দাবীর ভূমিকাটাকে অস্বীকার করে' অবাস্তর ইংরাজের 'সহনশীলতার' গুণকীর্তন করেছেন, এবং বুদ্ধিমানের মতো এই গ্রন্থের দায়িত্ব শরৎচন্দ্রের উপর চাপিয়ে দায় সেরেছেন। একই কারণে নজরুল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার শিকার হয়ে কারান্তরালে গেলে কবি সে ভূমিকার গুরুত্ব পরিহার করে টেলিগ্রাম পাঠালেন: অনশন ধর্মঘট ছেড়ে দাও। আমাদের সাহিত্য তোমাকে চায়।

আরও বিস্ময়, শরৎচন্দ্র যখন পথের দাবীতে সব্যসাচীর জবানীতে বলেন, "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকেই নিরতিশয় পবিত্র জ্ঞানে কারা আঁকড়ে থাকতে চায় জানো? জমিদার। এর স্বরূপ বোঝা ত' শক্ত নয়, বোন।" তখন রবীন্দ্রনাথ "রায়তের কথার" ভূমিকায় জমিতে রায়তের স্বত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'বলশেভিজমের' গন্ধ পান। এবং হাস্যকর যুক্তিতে রায়তদের হাতে জমিদারি ছেড়ে দিতে ভরসা পান না।

শরৎচন্দ্র আরও স্পষ্ট করে বলেন, "Permanent settlement এর জন্যই জমিদার। তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middleman সমস্ত সমাজের eccnomic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি!...জমি কেনা ও বেশি সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙলার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।"

বস্তুত সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিতন্ত্র সম্পর্কে এই তাঁর সুস্পষ্ট মতবাদ। তাঁর সাহিত্যকর্মে এই লক্ষণই তাঁকে পূর্ববর্তী লেখকদের বিরুদ্ধবাদী করেছে। অথচ যার সম্পর্কে বঙ্কিমের মন্তব্য, আমাদের মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব নির্ভর করছে। এই নির্ভরতা ভেঙে গেলে এতদিনকার সুপারস্ট্রাকচারের বনেদটাও ধ্বসে পড়ে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি যথার্থই বৈপ্লবিক। শরৎচন্দ্র তাঁর রচনায় কী ব্যক্তিগত জীবনে এর সঙ্গে আপস করেন নি। এমনকি গ্রামে বাড়ি তৈরি করলেও তথাকথিত মনীষীদের অনুকরণে জমিদারি কিনতে ঘৃণাবোধ করেছেন। শরৎ-সাহিত্যের এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে আড়াল করবার জন্যে স্বাভাবিক কারণেই এতদিনকার প্রতিষ্ঠিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী লেখকের ভিন্ন মূল্যায়নের নামে অপব্যাখ্যাও করেন।

শরৎসাহিত্য-আলোচক কলেজের মাস্টার এমনও মন্তব্য করেন পথের দাবী প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব নাকি শরৎচন্দ্র বুঝতে পারেন নি, নাকি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা রবীন্দ্রনাথের মতো ছিল না!

এই প্রশ্নটা নিয়েই আপাতত আলোচনা করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্র জীবনে একবারই মাত্র সক্রিয় রাজনীতিতে স্বল্পায়ু হলেও অংশ নিয়েছিলেন। সেটা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উষালগ্নে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠলে এবং 'বিপ্লববাদ' চাড়া দিয়ে উঠলে কবি অচিরে আন্দোলন থেকে সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে স্থায়ী বাসিন্দা হলেন। এমনকি অসহযোগ আন্দোলনে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষার

বিরুদ্ধে "জাতীয় শিক্ষা" প্রবর্তনের প্রয়োজনে যখন জাতীয় নেতৃত্ব ইংরাজের গোলামশালা থেকে ছাত্রদের বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার তাৎপর্য না মেনে "শিক্ষার মিলনে" য়ুরোপীয় শিক্ষার প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠলে শরৎচন্দ্র তার উত্তরে "শিক্ষার বিরোধ" রচনায় সাহসের সঙ্গে য়ুরোপীয় শিক্ষাসভ্যতার অন্তর্নিহিত সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রকে তুলে ধরলেন। ইংরাজি শিক্ষা যে এদেশে সাম্রাজ্যবাদেরই সহায়ক হাতিয়ার ছিল এ কথা কী নতুন করে বোঝাবার প্রয়োজন রয়েছে? অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের মহান আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ ক্যাণ্ডিতে বসে 'চার অধ্যায়ে' যখন কলঙ্কিত করলেন, ঠিক সেই বছরে সূর্য সেন সাম্রাজ্যবাদের জল্লাদের হাতে আত্মবলি দিলেন। 'চার অধ্যায়' ঝটিতি সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকা Asiaতে তর্জমা হয়ে গেল। শত শত কপি 'চার অধ্যায়' জেলখানায় পাঠানো হল বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্যে।

এই হল কবির রাজনৈতিক প্রজ্ঞা যা শরৎচন্দ্র অনুধাবনই করতে পারেন নি।

দ্বিতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রধান নায়ক-নায়িকা জমিদার। যদিও পরিসংখ্যান নিলে দেখা যাবে এ-অভিযোগ ধোপে টেঁকেনা। 'প্রেমিক' জমিদার বা জমিদার নন্দনই হোক তাদের বড়লোকি যে প্রজার শোষণে গড়েওঠা এ-সত্যকে তিনি গোপন করতেও চেষ্টা করেন নি। ইতস্তত এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচ্যুতি যদি কোথাও ঘটে থাকে তার জন্যে একা শরৎচন্দ্রকে দায়ি করা চলেনা, মনে রাখতে হবে জমিদারি-প্রভাবিত যে পিছুটান মধ্যশ্রেণীর সমাজ-বিন্যাসকে দীর্ঘদিন টিকিয়ে রেখেছে শরৎচন্দ্র একক-চেষ্টায় তার সর্বগ্রাসী সংক্রমণ থেকে মুক্ত হবেন, এমন চিন্তা বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে যায়!

তৃতীয় অভিযোগ, শরৎচন্দ্রও বঙ্কিমের মতো বিধবা বিবাহ দিতে পারেন নি। এ-ব্যাপারেও শরৎচন্দ্রের যুক্তি স্পষ্ট, সমাজকে আঘাত দিয়ে সমাজের স্বীকৃতির মাধ্যমে যদি এ বিবাহ না ঘটে তাহলে কলমের ডগায় তিনি হাজার বিধবা বিবাহ দিলেও তা সার্থক হবে না। সামাজিক স্বীকৃতির দৈন্যে রমা-রমেশের যে বিবাহ হতে পারল না তার ফলে দুটো মানুষের জীবনই নয়, একটা পল্লীসমাজের গৌরবময় সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ অভিযোগ, শরৎচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি।

তাই তাঁর প্রধান চরিত্রগুলি ব্রাহ্মণ। কথাটা উল্টো করে বললে কী এই বোঝায়না যে, হিন্দুধর্মের সংস্কারগুলি তথাকথিত ব্রাহ্মণেরাই ধরে রয়েছে, সেই চরিত্রগুলির মাধ্যমেই শরৎচন্দ্র গোটা হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছেন? প্রতিহিংসাপরায়ণ সমাজ শিরোমণিদের একযোগে লেখককে আক্রমণ কী এটাই প্রমাণ করেনা যে, লেখকের লক্ষ্য সঠিক ছিল?

বিরুদ্ধবাদীদের এই সকল অভিযোগের ফাঁদে পা দিয়ে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। উপরন্তু সচেতন পাঠকের গ্রহণক্ষমতার প্রতি আমাদের অগাধ বিশ্বাস।

শরৎচন্দ্রের সচেতনতা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ সামন্ততান্ত্রিক স্ট্রাকচারের উপরই নিবদ্ধ রইল না, তস্য প্রতিক্রিয়াজাত সুপারস্ট্রাকচারের দিকেও তিনি কামান দাগলেন। পথের দাবীর পর তাঁর প্রধান সাহিত্য কর্ম 'শেষ প্রশ্ন'। এখানে তিনি আমাদের সনাতন ধ্যানধারণাপুষ্ট চিন্তার গতানুগতিকতাকে সঠিকভাবে ঘা মারতে শুরু করলেন। ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ, আশ্রম, অধ্যাত্মসাধনা, মায় সতীত্ব, একনিষ্ঠ প্রেমজাতীয় ভারতীয়-লেবেল-মারা জগদ্দল ভাববাদী চর্চাকে নস্যাৎ করে যুক্তিনিষ্ঠ, গতিশীল বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করলেন। ভাববাদের বিরুদ্ধে শেষ প্রশ্নের এই তাত্ত্বিক যুক্তিনিষ্ঠা স্বভাবতই ঐতিহ্যপন্থী, রক্ষণশীলদের মনঃপুত হয়নি। সমালোচকেরা প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগলেন, শেষ প্রশ্নে শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অপস্মৃতি ঘটেছে। কোনো কাহিনী নেই, কমল শুধু কথাসর্বস্ব, তার কথায়-আচরণে মিল নেই, ইত্যাদি। মূর্খেরা বোঝেনা, 'শেষ প্রশ্ন' একটি তত্ত্বমূলক গ্রন্থ, কাহিনী রচনায় পটু লেখক এখানে তথাকথিত বর্তুল কোনো কাহিনী বুনতে চেষ্টা করেন নি। 'বিপ্লবিনী' কমল যেটুকু ছুঁৎমার্গ দেখিয়েছে সে কনসেশনটুকু না-দিলে এ-গ্রন্থে তথাকথিত ভদ্দরলোকদের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পারত না! এই ছিদ্রান্বেষী ভদ্রলোকদের লেখক ভালো করেই চিনতেন। এ যেন ধর্মের রসে বুঁদ ভারতীয় জনসাধারণের মন কাড়বার জন্যে গান্ধীজীর রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানোর কৌশল।

অথচ এ-কনসেশনটুকু দিয়েও শরৎচন্দ্র তার উদ্দেশ্য হাঁসিল করে নিয়েছেন।

'পথের দাবী' যদি রাজনৈতিক কর্তব্য সম্পাদন করে থাকে তাহলে 'শেষ প্রশ্ন' একজাতীয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নান্দী।

ধর্ম-আশ্রম-অধ্যুষিত দেশে এই বদ্ধমূল সংস্কারগুলোকে আঘাত করা যে কী বৈপ্লবিক কাজ, তা সবাই স্বীকার করবেন। কারণ এরি উপর আমাদের সমাজচিন্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

এই নতুন ঐতিহ্যসৃষ্টিকারী সারস্বত সাধনার কারণে শরৎচন্দ্র প্রথমাবধি সমাজের তরুণ সম্প্রদায়কে তাঁর পাশে পেয়ে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী যুবগোষ্ঠী তো বটেই, এমনকি ছাত্র দলকেও।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ধারণার বিপরীতে সেদিন যে নতুন শক্তিমান সাহিত্যিকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল শরৎচন্দ্র স্বাভাবিক কারণেই তার সারথ্য গ্রহণে উৎসুক হন। কারণ এঁদের সত্য সাধনাই তাঁর অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এমন আশা তাঁর ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে যুক্তিনিষ্ঠ বস্তুবাদী সাহিত্য ঐতিহ্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সেদিনকার নতুন সাহিত্যিকগোষ্ঠী দেশের বৃহত্তর সমস্যাকে উপেক্ষা করে' যখন উদ্ভট দেহসর্বস্বতায় মেতে উঠলেন তখন শরৎচন্দ্র নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন। ফলে শরৎচন্দ্রের একক চেষ্টায় যে বস্তুবাদী ধারা গড়ে উঠতে চাইছিলো, পরবর্তী লেখকদের ফ্যাশান-সর্বস্বতায় তা আবার ক্ষীণ হয়ে মিলিয়ে গেল। সাহিত্যের পুরনো ঐতিহ্যই আবার সমাজ শরীরকে জরদ্গব করে তুলল।

'বঙ্গবাণীতে' ধারাবাহিক প্রকাশিত পথের দাবীর প্রেস কপিতে ২৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩-এ শরৎচন্দ্রের মন্তব্য কম ইঙ্গিতবহ নয়। তিনি লিখেছিলেন, "পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে এই কামনা করি।"—শ

শরৎচন্দ্রের এই অসমাপ্ত কাজের ভার কী কেউ নিলেন?

যে-শরৎচন্দ্র মন্তব্য করলেন 'গর্কির লেখা পড়লে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে আসে' এবং যিনি বাঙলা সাহিত্যের ভবিষ্যত রাশিয়ান সাহিত্যের মতো নীচুতলার মানুষের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, সে-আশ্চর্য বাস্তব ইঙ্গিতটিও কী কারুর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে সেদিন?

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণকালে জানি না কোন্ কারণে অসুস্থ গর্কিকে দেখবারও সময় করতে পারলেন না! অবশ্য ১৯৩০-এ রাশিয়া ভ্রমণের আগেই ১৯২৪-এ "পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারির" পরিশিষ্টে ২৭ সেপ্টেম্বর গর্কির "টলস্টয় স্মৃতি" সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করে কটাক্ষ

করেছেন "...গোর্কির আর্টিস্ট-চিত্ত তো বৈজ্ঞানিক হিসাবে নির্বিকার নয়। তাঁর চিত্তে টলস্টয়ের যে ছায়া পড়েছে সেটা একটা ছবি হতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক হিসাবেও সেটা-যে সত্য তা কেমন করে বলব? গোর্কির টলস্টয়ই কি টলস্টয়? বহুকালের ও বহুলোকের চিত্তকে যদি গোর্কি নিজের চিত্তের মধ্যে সংহত করতে পারতেন তা হলেই তাঁর দ্বারা বহুকালের ও বহুলোকের টলস্টয়ের ছবি আঁকা সম্ভবপর হত।" আসল ব্যাপার গর্কির "সর্বহারার মানবতাবাদ" রবীন্দ্রনাথের "শ্রেণীসমন্বয়বাদের" সঙ্গে মেলেনি। জনৈক রবীন্দ্র গবেষক ১১ জুলাই ১৯৩৬ ভবানীপুরে আশুতোষ হলে গর্কির স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথের বাণী প্রেরণের ঘটনায় কী প্রমাণ করতে চেয়েছেন তিনিই জানেন। গবেষক যথাযথ বাণীটি উদ্ধৃত করে দিতে পারলে আমাদেরও অনেক পণ্ডশ্রম বাঁচত! "কবিগুরু" রুডিয়ার্ড কিপলিঙের মৃত্যুতেও বাণী পাঠিয়েছেন যার মধ্যে কিপলিঙের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের পরিচয় নেই! অথচ রাজনীতিক ও কবি সরোজিনী নাইডু সে সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রটিরও উল্লেখ করতে ভোলেন নি!

ব্রিটিশ শাসন ও মধ্যশ্রেণীর সাহিত্য

পরিশ্রমী পাঠক বাঙলা সাহিত্যের দিকে একবার মনোযোগী দৃষ্টি দিলে যে-দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চোখে পড়বে তা হচ্ছে আমাদের প্রধান সাহিত্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি যেমন বিরুদ্ধতা নেই তেমনি নেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্ট জমিদার শ্রেণীর প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা।

অথচ দীর্ঘকাল এই দুটি শক্তিই এ দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সামাজিক শোষণের মূল। এবং প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না এই শোষণের বিরুদ্ধে বারবার নিষ্পেষিত মানুষ বিদ্রোহ করেছেন, বিক্ষোভ করেছেন। তা যতই স্থানিক বা আঞ্চলিক হোক সে গণআন্দোলন। অর্থাৎ এই বিদ্রোহগুলিই প্রমাণ করে এই শোষণের যন্ত্রটি সম্পর্কে জনমানস সচেতন ছিল। প্রায় গোটা উনিশ শতক মূলত কৃষি-সংশ্লিষ্ট এই আন্দোলনের দ্বারা রক্তাক্ত।

এই যদি বাস্তব অবস্থা হয় তাহলে প্রশ্নটি সঙিনের মতো উদ্যত হতে বাধ্য, কেন আমাদের প্রধান প্রধান সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারিপ্রথার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক জেহাদ নেই!

এই প্রশ্নের চাবি আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্র।

রবীন্দ্রনাথের মতে, "বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি।" [রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড পৃষ্ঠা ৫১৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "১৭৯৩ সালে যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নির্মিত হইয়াছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ধ্বংসে বঙ্গ সমাজের ঘোরতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।" [বঙ্গদেশের কৃষক, ৪র্থ পরিচ্ছেদ পৃষ্ঠা ৮৪]

এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সত্যদ্রষ্টা। বঙ্কিম এগিয়ে এসে পুরো ব্যাপারটাকেই ফাঁস করে দিয়েছেন।

তাঁরা যে বঙ্গসমাজের কথা বলেছেন, যা সম্ভব হয়েছে ইংরাজের আগমনে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে যাকে ঐতিহাসিক পরিভাষায় "মধ্য শ্রেণী" আখ্যা দেয়া হয়েছে, যার অস্তিত্ব ইংরাজ-সমর্থনে তথা জমিদার ও মধ্য-স্বত্বভোগীর প্রশ্রয়ে, সেই বিশেষ শ্রেণীর জন্যেই 'ভারত-পথিক' রামমোহন পথ তৈরি করে গেছেন। যে-পথে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারি-প্রথার সঙ্গে সংঘর্ষের কথা ওঠেই না।

সমস্যাটা হয় যখন এই শ্রেণীগত ধারণা নির্বিশেষে আপামর দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টির ওপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা হয়। যেহেতু এই ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর দর্শন 'অ-শিক্ষিত' জীবন ও জীবিকায় জর্জরিত অসন্তুষ্ট মানুষ গ্রহণ করেননি।

এমন কেন হয়? এর চমৎকার উত্তর: শ্রেণী-অধ্যুষিত সমাজে ইতিহাস সর্বদাই ক্ষমতাবান শাসকবর্গ ও তার সহযোগী শ্রেণীর ইতিহাস।

রামমোহন থেকেই আমাদের মধ্যশ্রেণী এই ইতিহাস রপ্ত করে উত্তরাধিকার সূত্রে বহুদিন তার পতাকা বহন করে চলেছে।

পলকে প্রণয় কথাটা কী পরিমাণ সত্যি তা উনিশ শতকের বাঙালী ভদ্রলোকদের দেখেই বোঝা গেল। কোম্পানির শাসনভার গ্রহণ করার কালেই তাঁরা বুঝে ফেলেছিলেন ইংরাজ-শাসন এদেশে বিধাতার আশীর্বাদ এবং আমাদের সাবালক করার প্রয়োজনে প্রভুদের দীর্ঘকাল এদেশে থাকা উচিত। কারণ? কারণ মুসলমান শাসন অত্যন্ত বর্বর এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ইত্যাদি। যে 'হিন্দুদের' জন্যে এই সুপারিশ সেই বিত্তবান্ হিন্দুরা কিন্তু মুসলিম আমলে সরকারের ফিনান্‌সিয়ার হিসাবে সরকারে এতাবৎকাল যথেষ্ট প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি খাটিয়েছে। মুসলিম শাসনে হিন্দুদের 'দুর্গতির' যে লোকপ্রিয় প্রবাদ রয়েছে তার মূলে সরকারি কর ফাঁকি দেবার অপচেষ্টাটা ঢাকা দেবার কৌশলটুকুও কাজ করছে। কারণ সরকার ইসলামই হোক কি ইংরাজই হোক হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র মানুষ নির্বিশেষে একই ভাবে বঞ্চিত। বিত্তবান্ হিন্দু-মুসলমান বিত্তহীন মানুষদের কথা কোনোকালেই ভাবেনি।

এই বিত্তবান্ হিন্দু ফিনানসিয়ারদের উজ্জ্বল প্রতিনিধি জগৎশেঠ, যে-বেনিয়াটি নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজের সঙ্গে চুক্তি করে নবাবকে ফাঁসিয়ে দিতে পেরেছিল। ইতিহাসে যার নাম পলাশীর যুদ্ধ।

বিশেষ করে বাঙালী ভদ্দরলোকেরা যখন মুসলিম শাসনের নিন্দা করেন

তখন ব্যাপারটা বেশ মজাদার হয়ে ওঠে। এ কথা ঠিক ভারতে তখন মুঘল শাসনের ক্ষয় শুরু হয়েছে, যদিও ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরেও মুঘল শাসন ব্যবস্থা একেবারে শেষ হয়ে যায় নি এবং তখনো এই বাঙলা দেশ সমৃদ্ধির চূড়ায় বাস করছে, এমতাবস্থায় বাঙালী "হিন্দুরা" খামোখা বাঙলা দেশের শাসন সম্পর্কে কেন নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠে বিদেশী শাসনের জয়গানে মুখর হয়ে উঠলেন তার কারণ বোঝা কী খুবই কষ্টকর ?

এই হচ্ছে বেনিয়াদের চরিত্র, যখন যে শাসকগোষ্ঠী আসে তখন তারা তাদেরই সহযোগী হয়ে ওঠে। দিল্লির মুঘল বাদশাহের ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা এবং ইংরাজ বণিকদের একেকটি করে বাণিজ্যকেন্দ্র দখল, সেনাবাহিনী ও দুর্গ নির্মাণ এবং আরো বেশি করে বাণিজ্যের কর্তৃত্বের জন্যে অবশ্যম্ভাবী শাসনভার দখল করার হিসাবটা ইংরাজের সঙ্গে এই হিন্দু বেনিয়ারাও বুঝতে পেরেছিল। তাই আগে ভাগেই তারা ইংরাজের সমর্থক 'বেরাদার' হয়ে যেমন যেমন প্রভু একেকটি প্রদেশ দখল করেছে বাঙালী ভদ্রলোক তার জুনিয়ার পার্টনার হয়ে সে সে প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সারা ভারতের মানুষ সাহেব প্রভুদের সঙ্গে এই বাঙালী নেটিভ বাবুদেরও তাদের হুজুর বলে চিনেছে।

ইংরাজি শিক্ষিত মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার চেহারাটা যদি এই হয় তাহলে এই শ্রেণী-জাত লেখকদের সাহিত্য-ধারণা স্বাভাবিকভাবে এমনটিই হবে। এ দেশের বৃহত্তর মানুষের পাহাড়প্রমাণ অশিক্ষার কারণে সাহিত্যের হাটে লেখক তথা পাঠকের চৌহদ্দি তথাকথিত মধ্যশ্রেণী। যাদের চরিত্রে ইংরাজের প্রতি নিঃশর্তে দাসখত এবং টিকে থাকার জৈবিক তাড়নায় জমিদার কিংবা মধ্য-স্বত্বভোগীর অনুগ্রহে গাঁটছড়া বাঁধা।

আমাদের প্রধান সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র নিজ শ্রেণীর প্রতি আনুগত্যের কারণেই ইংরাজ-বিরোধিতার বিষয়টি চিন্তাও করতে পারেননি! এমন কি মধ্য শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে কেউ যদি সামান্য সৎসাহসও দেখাবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তার বিরূপতা করেছেন। দীনবন্ধু মিত্রের নীল দর্পণ কিংবা মুশারফ হোসেনের জমিদার দর্পণ সাহিত্য সম্রাটের অনুমোদন পায় নি। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণীতে তিনি সজ্ঞানে জনগণের ইতিহাসকে ধর্ষণ করেছেন। অথচ ভাবতে অবাক লাগে এই বঙ্কিমই তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নিবন্ধগুলিতে জমিদারি শোষণের অন্যায়কে ধরিয়ে দিয়েও শ্রেণীস্বার্থে জমিদারেরই নুন খেয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথও একই কারণে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 'সহিষ্ণুতার' প্রশংসা করেছেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিক খ্যাতির সুনামকে খর্ব করে ১৯১৫-তে সম্রাটের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ নির্দ্বিধায় নাইট উপাধি গ্রহণ করতে পারলেন। ১৯১৭-১৮-তে তাঁর প্রিয় থিসিস "ছোট ইংরেজ বড় ইংরেজ"। এমন কি ১৯১৯-এ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি ভাইসরয় লর্ড চেমসফোরডকে উপসংহারে লিখছেন: "...রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে।...বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীল শ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।" [প্রভাতকুমার। রবীন্দ্র-জীবনী ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০] জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরও রবীন্দ্রনাথের এদেশের ইংরাজ শাসকদের চরিত্র সম্পর্কে মোহভঙ্গ হয়নি। ১৯৩১-এ হিজলী জেলে গুলিচালনার বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত ভাষণে পুনরায় জানিয়েছেন "ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে"। সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র যে সর্বসময় এক, এটা জানা সত্ত্বেও কবি বারবার এক মায়ার মধ্যে আটকে পড়েন। একই কারণে শরৎচন্দ্রের পথের দাবীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের যে দুঃসাহসিক মুখোশ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেখানে তাঁর সমর্থন মেলেনি। বরং পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুলনায় ইংরাজ যে কত ক্ষমা ও সহনশীল তার পক্ষে ওকালতি উপস্থিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জানতেন ইংরাজ তার শাসনের শৈশবেই তথাকথিত বাঙালী ভদ্দরলোকদের মস্ত সমর্থক পেয়ে ক্রমে সারা ভারতে তাদের শাসনরূপী শোষণের জাল ফাঁদতে পেরেছিলেন। ১৭৫৭-তে এই বাঙলার মাটিতেই পলাশীর যুদ্ধ নামক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কাজেই প্রথম থেকে এ দেশে বাঙালী নামক ভদ্দরলোকরা ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টায় বাধা দেয়নি। কাজেই বঙ্গদেশে সাম্রাজ্যবাদী নখদন্ত তেমন করে প্রকটিত হবার সুযোগ পায়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, বাঙলা দেশই তো সেদিন সারা ভারতবর্ষের ক্লীবত্বের চেহারা ছিল না! রবীন্দ্রনাথ জীবনে একবারই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেটা

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সেই আন্দোলন যখন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র ধারণ করল তখন রাজনীতিবিমুখ কবি সরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে কোটরবাসী হলেন!

এই হল কবির সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে মনোভাব। অন্যদিকে জমিদারি ব্যবস্থার বিপক্ষেও যে তিনি যেতে পারেন নি তার কারণ তিনি "ব্যক্তি-বিশেষের সম্পত্তি-অধিকারকে ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক" বলে মনে করতেন। [প্রভাতকুমার/রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৭] বিষয়-সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি পিতার সুযোগ্য নির্বাচন। রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভা জমিদারি রক্ষণের ব্যাপারেও যে-অসাধারণ নৈপুণ্যের প্রমাণ রেখেছে যার জন্যে শুধু শিলাইদহ নয়, কুষ্টিয়া, উড়িষ্যার সমূহ জমিদারির দেখাশোনার ভার তাঁর ওপর বর্তেছিল। মহর্ষি জমিদারির ব্যাপারে অন্য পুত্রদের অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথকে নির্বাচন করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সোভিয়েত রাশিয়ায় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কিংবা প্রথম চৌধুরীর 'রায়তের কথা'র ভূমিকা লেখার কালেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারি ছাড়ার কথা ভাবেননি। সোভিয়েত তীর্থভ্রমণের অব্যবহিত পরেই কবি আমেরিকার ধর্ণা দিয়ে বসলেন রকফেলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সাধের শান্তিনিকেতনের জন্যে কিছু অর্থভিক্ষার আশায়! বলাবাহুল্য রকফেলার তাঁকে নিরাশ করেন। অন্যদিকে রায়তের কথার ভূমিকায় তিনি কার হাতে জমিদারি ছেড়ে দেবেন এই দুশ্চিন্তায় ব্যস্ত। কারণ লোভী রায়তরা নিজেরাই একেকজন রক্তচোষা জমিদারে পরিণত হবে!

শরৎচন্দ্রে সাম্রাজ্যবাদ তথা জমিদারির বিরুদ্ধে একটি সঠিক বস্তুবাদী দৃষ্টির উন্মেষ দেখা যায়। জমিদারেরা যে প্যারাসাইট, কৃষকদের দুর্গতির মূল জমিদার শ্রেণী একথা সঠিক জেনেও মধ্য শ্রেণীর মানসিকতার যে সর্বগ্রাসী আকর্ষণ, বিশেষ করে জমিদারশ্রেণীর প্রতি দুর্বলতা, তার থেকে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্ত হতে তিনি পারেননি।

শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকার সেকালে বহন করেছিলেন আরেকজন লেখক। তিনি প্রেমচন্দ।

সিপাহী বিদ্রোহ ও সেকালের বাঙালী ভদ্রলোক

সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হলে কলকাতায় ইংরাজ অধিবাসীরা প্রথমটায় সাংঘাতিক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাত্রিবেলা তারা ভয়ে ভয়ে জাহাজে আশ্রয় নেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করত।

ইংরাজদের এই আতংকিত অবস্থা দেখে "বাঙালী নেতৃবর্গ" গুরুতর কর্তব্যবোধে তাঁদের বিশ্বস্ততার প্রমাণস্বরূপ প্রকাশ্যে সভা-সমিতি করে এবং প্রস্তাব পাঠিয়ে শ্বেতাঙ্গদের নিরুদ্‌বেগ করবার চেষ্টা করেন।

"বিশ্বস্ত নাগরিকদের" সভা ডাকা হল "হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজের হল্‌ঘরে।" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বিদ্রোহী সিপাহীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করে প্রস্তাব পাশ করলেন। রাজা বাহাদুর রাধাকান্ত দেব ১৮৫৭ এর ১৫ মে "নেটিভ সমাজের একটি সাধারণ সভা" ডাকলেন। ইংরাজি প্রস্তাবের তর্জমা ছাপানো হল এবং জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা হল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সমীপে ১৮৫৭-এর ১৩ মে পাঁচ দফায় আনুগত্য জানিয়ে প্রস্তাব পাঠালেন। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, ডি. পি. প্রতাপচন্দ্র সিংহ, প্রমুখ। সেই প্রস্তাবও যথারীতি বাংলায় তর্জমা করে ছাপিয়ে সাধারণ্যে বিলি করা হয়।

এছাড়াও উত্তরপাড়া, ভদ্রকালী, কোতরঙ, কোন্নগর, এবং সন্নিহিত পল্লীর জমিদার, তালুকদারগণ হুগলি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দরবারে তাঁদের বিশ্বস্ততার স্মারক পত্র পাঠালেন। এই স্মারকপত্রের স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ছিলেন উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য ভূস্বামী জয়কৃষ্ণ মুখুজ্যে। এঁরা অধিকন্তু স্থানীয় অঘোরী, গোয়ালা, বাগদি, ডোমদের নিয়ে একটি সামরিক বাহিনী গঠন করবার পরামর্শ দিলেন যাদের কর্তব্য হবে পলাতক বিদ্রোহী সিপাহীদের মোকাবিলা করা। সরকার এই পরামর্শ গ্রহণ করেন। ইংরাজদের সমর্থন করে আরো সভা-সমিতি শুরু হল। বালীদেওয়ানগঞ্জ, বাঁকুড়া, নোয়াখালি, সিলেট, রাজশাহী, শান্তিপুর তথা কলকাতাতেও। কলকাতার দুটি মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন পর্যন্ত ইংরাজকে সমর্থন জানাল।

বর্ধমানের মহারাজা রাধাকান্ত দেব, কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং আরো ২৫০০ বঙ্গসন্তান লর্ড ক্যানিঙের কাছে তাঁদের প্রস্তাব পাঠালেন।

তৎকালীন ভারত সরকারের সেক্রেটারি সিসিল বীডন উত্তরে লিখে পাঠালেন: "If peace, order, and security are valuable to any, they are so to those who, like the foremost among you, hold high rank, large hereditary possessions, accumulated wealth and respected social posicions."

এই উক্তিই সেই সময়কার "নয়া ধনীদের" চিত্র তুলে ধরেছে! অন্য এক প্রস্তাবে মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় তথা "৫০০০ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার" নেটিভ যাঁদের মধ্যে রয়েছেন রাজা জমিদার-তালুকদার-বণিককুল, লর্ড ক্যানিঙের কাছে যথোচিত সমর্থন পাঠালেন।

এছাড়াও উৎসাহী ইংরাজ সমর্থকদের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে শ্রীরামপুরের গোঁসাইদের, কলকাতার শ্যামচরণ মল্লিক, (এঁর হাতে ছিল প্রচুর সরকারী ঋণপত্র), কুমিল্লার বংশীলোচন মিত্র, কলকাতার শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, ভুলোয়ার রাজা, তাঁদের নায়েব যশোদাকৃষ্ণ পাইন, প্রাণকৃষ্ণ ও জগৎচন্দ্র সিংহ রায়চৌধুরী, পাণিহাটির জমিদার, ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল, শান্তিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, মুর্শিদাবাদের নবাব, আনন্দকিশোর রায়, ঢাকার জমিদার, ঢাকার মৌলভী আলী ও আবদুল গণি, রামচন্দ্র, ময়মনসিংহের জমিদার, প্যারিমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ।

শেষোক্ত জন "জঙ্গী মুন্সেফ"। "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" কাগজে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়:

"Take the most timid quaking wretch of a kayust (kayastha) you can find, put him in any district in India with a shadow of authority, and if he does not make Punjabee and Sikth, Marhata and Hindusthanee, work themselves to death for his benefit, and think all the while it is for their own, he is no true Bengali."

বাঙালী "ভদ্রলোকদের" এই চরিত্র দেখলেই বোঝা যায় কেন এই শ্রেণী সেকালে বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করেননি। ইংরাজ প্রভুকে সর্বপ্রথম এঁরাই "বিধাতার আশীর্বাদ" বলে গ্রহণ করেছেন। কারণ বিধাতাধন্য

শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সহবাসেই তাঁদের আর্থিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কল্যাণে ভূস্বামী শ্রেণী এবং তারই আশ্রয়ে পুষ্ট হতে শুরু করেছে "মধ্যশ্রেণী"।

ইংরাজ-বিরোধিতার অর্থ তাঁদের সৌভাগ্যের পতন। কারণ শুধু জমিদার হিসেবেই নয়, নতুন মধ্যশ্রেণী ইতিমধ্যেই ব্যবসা এবং চাকরির ক্ষেত্রে ইংরাজের জুনিয়ার পার্টনার হয়ে গেছে।

ইংরাজদের জন্য এই নির্লজ্জ ওকালতি "বিদ্রোহীরা" সেকালে ক্ষমা করেননি। বেরিলিতে বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের ঘৃণা এত দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়েছে। সেকালে ফারাক্কাবাদ বা কানপুরে ইংরাজদের মতনই বাঙালী বাবুরা বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েছিলেন। সে সময়ে (১৮৫৭-এর এপ্রিল-মে) সিমলায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও অস্বস্তির মধ্যে কাটাতে হয়।

সম্ভবত এই সকল কারণে সুভাষচন্দ্রকে পর্যন্ত স্বীকার করতে হয়, উনিশ শতকে বাঙালী দেশটাকে ইংরাজদের কাছে বিকিয়ে দিয়েছিল, বিশ শতকে তাই তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

সিপাহী বিদ্রোহে যে বাঙালী ভুল করেছিল সে কথাও তিনি অকপটে স্বীকার করে গেছেন।

কৌতুকের বিষয় বহু যুগ পরে আজো পর্যন্ত শিক্ষিত বাঙালীর অভাব নেই যাঁরা সিপাহী বিদ্রোহে তৎকালীন বাঙালীর ভূমিকাকে যুক্তিপূর্ণ বলে গ্রহণ করেন। কারণ তাঁরাও বিশ্বাস করেন ঘটনাটি একটি নিছক সিপাহী বিদ্রোহ এবং মুঘল বাদশাহকে ফিরিয়ে এনে ইংরাজ আনীত আধুনিক যুগকে মধ্য যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বেশির ভাগ বাঙালী ঐতিহাসিকগণও এই মতের সমর্থক। যদিও বাস্তব ঘটনা আলাদা। বিদ্রোহ সিপাহীদের মধ্যে প্রথম শুরু হলেও অনতিকালেই তা কৃষক ও নিম্নবর্গের সাধারণ মানুষের যোগদানে একটি জনপ্রিয় অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ এই অভ্যুত্থানে শামিল হন। এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ পরবর্তীকালে ইংরাজের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার শিকার হন।

এই বাস্তব ঘটনা বিস্মৃত হলে আমরা অবিচারই করব।

সিপাহী যুদ্ধ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যে

ইংরাজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন মাত্র রাজশক্তি প্রথমাবধি সাফল্যের সঙ্গে যে কাজটা করতে পেরেছিল সেটা হচ্ছে এদেশে দাসমনোভাবাপন্ন একটা জাত সৃষ্টি করা। যারা ইংরাজের কাছে সুবিধে পেয়ে রাজভক্তি ও দেশ সেবাকে সমার্থক করতে পেরেছিল। যেহেতু বঙ্গদেশেই এই প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল সেই কারণে উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু সোজাসুজি এই ভূমিকায় নেমে আসে ব্রিটিশ শাসনের গৌরব বোঝবার আগেই এই বঙ্গসন্তানগণ সম্ভবত। ত্রিকালদর্শিতার কারণেই ইংরাজ শাসন বিধাতার আশীর্বাদ বলে স্বীকার করে নিয়েছিলো। তারপর গোটা বিগত শতাব্দী জুড়ে এই কৃতী সন্তানগণ দেশ-সেবার সঙ্গে রাজভক্তিকে একই অঙ্গে বেঁধে নিল। তাই পলাশীর যুদ্ধ, সিপাহী যুদ্ধে প্রভুর জয়ের আনন্দে আহ্লাদিত বঙ্গসন্তানগণ বিজয়োৎসব করেছে। এবং ইংরাজের গুণগ্রাহিতায় তাদের আনুগত্য প্রচার করতে শ্লাঘা বোধ করেছে। ফলে উনিশ শতকে এই কৃতী বাঙালী এদেশ শাসনে ও শোষণে ইংরাজের সঙ্গে সর্বভারতীয় মানুষের কাছে শাসকচক্রে উন্নীত হয়েছে। শাদা সাহেবদের মতো এই কালো সাহেবদেরও সর্বভারতীয় মানুষ সন্দেহ, সংশয় এবং ঘৃণার চক্ষে দেখেছে।

সিপাহী যুদ্ধে তাবৎ বঙ্গসন্তানদের বিরোধিতা এবং রাজানুগত্য প্রমাণ করে ইংরাজ ও তাদের স্বার্থ অভিন্ন। এই ভূমিকার জন্যই উত্তর ভারতে বাঙালীকে ইংরাজদের মতোই সিপাহী যুদ্ধকালে নিগৃহীত হতে হয়েছে।

সিপাহী যুদ্ধে বাঙালী ভদ্দরলোকের রাজানুগত্য কী বীভৎস পর্যায়ে গেছে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দক্ষিণারঞ্জন মুখুজ্যে, যাঁকে ইয়ং বেঙ্গল তথা ডিরোজিওর প্রিয় শিষ্য বলে অভিহিত করা হয়। এই দক্ষিণারঞ্জন সিপাহী যুদ্ধের সময় লণ্ডন টাইমস-এ ব্রিটিশের সমর্থনে প্রবন্ধ লিখেছেন। যুদ্ধের অবসানে মহারানী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির হাত থেকে শাসনভার গ্রহণ করলে সর্বত্র বাঙালী ভদ্দর-লোকদের মধ্যে উৎসব শুরু হয়। দক্ষিণারঞ্জন তখন ঢাকায়। ১৮৫৯-এ ২৮ জুলাই ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা মিলে মহারানীর উদ্দেশে পরমেশ্বরের নিকট শুভাশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। দক্ষিণারঞ্জন ব্রাহ্ম সমাজের অনুরোধে ঐ উৎসবের দিনে একটি মনোরম বক্তৃতায় ব্রিটিশ রাজত্বের সুফল বুঝিয়ে দিয়ে পরমেশ্বরের নিকট ভারতবর্ষের ও ভারতেশ্বরীর মঙ্গল কামনা করেন। এমত রাজভক্তির পুরস্কার দক্ষিণারঞ্জন হাতে হাতে পেলেন। ইংরাজ

গুণীর মর্যাদা দিতে জানতেন। এই মহৎ কার্যে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর মুরুব্বি পেয়েছিলেন আলেকজাণ্ডার ডাফকে, যে ধুরন্ধরটির পরিচয় শুধু এদেশে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারে। আসলে এই ডাফ সাহেব সাম্রাজ্যবাদেরই চর, যিনি সিপাহী যুদ্ধের উপর কেতাব লিখেছেন এবং যুদ্ধকালে ক্যানিংকে অনেক বিষয়ে সৎ পরামর্শও দিয়েছেন। ডাকের সুপারিশেই ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনের মতো রত্নকে চিনলেন এবং ১৮৫৯-এর ২৫ অক্টোবর লর্ড ক্যানিং লখনৌয়ে একটি দরবারে দক্ষিণারঞ্জনকে রায়বেরেলীর অন্তর্গত শঙ্করপুরের বাজেয়াপ্ত তালুক দান করেন। এবং বঙ্গসন্তানটিকে সেই প্রদেশের অবৈতনিক অ্যাসিসট্যান্ট কমিশনারও বানিয়ে দেয়া হয়। শঙ্করপুরের তালুকটি ছিল বিদ্রোহী জমিদার রাজা বেনীমাধো বক্সের সম্পত্তি। তালুকের আয় তখন পঞ্চ সহস্র মুদ্রা।

কেন দক্ষিণারঞ্জনকে নির্বাচন করা হল?

সিপাহী যুদ্ধের পর অযোধ্যার দুর্বিনীত ভূম্যধিকারীদের ব্রিটিশ সরকারের বশ্যতা স্বীকার করাতে হবে। অযোধ্যায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দুর্দান্ত তালুকদারদের বশীভূত ও রাজভক্ত প্রজারূপে পরিণত করবার সাধু উদ্দেশ্যে ডাক্তার ডাফের পরামর্শে লর্ড ক্যানিং দক্ষিণারঞ্জনকেই যোগ্য বলে বিবেচনা করলেন।

কিশোরী চাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড' পত্রিকা ১৮৫৯-এর ১২ নভেম্বর সন্তোষ প্রকাশ করে উপসংহারে লিখলেন: "Being a high caste Brahmin. it was thought his influence might be beneficially exerted in Oude, where Rajpoots and Brahmins abound" ইত্যাদি।

দক্ষিণারঞ্জন অবশ্যই তাঁর উপর ন্যস্ত দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করেন। অযোধ্যায় তিনি তালুকদারদের নিয়ে" ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন" খোলেন। এই সভায় নানাবিধ উৎকৃষ্ট কাজের মধ্যে ১৮৬২-এর ৬ মার্চ ভিক্টোরিয়ার স্বামী প্রিন্স এলবার্টের মৃত্যুতে দক্ষিণারঞ্জন মর্মস্পর্শী করুণরসাত্মক বক্তৃতা দেন এবং মহারাজ্ঞীকে সান্ত্বনাপত্র প্রেরণের প্রস্তাব পেশ করেন। যথারীতি দক্ষিণারঞ্জন লিখিত এই সান্ত্বনাপত্র মহারাজ্ঞীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল। একই বছরে মহামতি ক্যানিং পরলোকগমনকালেও বঙ্গসন্তানটি পুনরায় করুণরসাত্মক বক্তৃতা করেন এবং স্মৃতিরক্ষার্থে "ক্যানিং কলেজ" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

গুণগ্রাহী ইংরাজ তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে ভোলেন নি। ১৮৭১-এর ৫ মে লর্ড মেয়ের তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৭৮-এর ১৫ জুলাই ৬৪ বছর বয়সে দক্ষিণারঞ্জন তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

প্রসঙ্গ ঃ সাহিত্য

সাহিত্যে অপ্রধান লেখক ও বিবিধ

পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, প্রকাশক্ষমতা, বিশিষ্ট মানসিকতা এবং অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণে একজন সৃজনশীল লেখকের জন্ম। এতগুলি বৈশিষ্ট্যের কোনোটিকে বাদ দিয়ে যথার্থ লেখক হওয়া যায় না। ফলে পত্র পত্রিকায় অজস্র লেখা বেরোলেও এঁদের মধ্যে অনেকেই লেখক নন, কেউ কেউ লেখক। অথচ এমন একটা কঠিন ব্যাপার তার আসল-নকল যাচাই করবার ফুরসত নেই যতক্ষণ না সময়ের ধোপে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। ভেবে দেখুন শরৎচন্দ্রের আমলে বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবাসী পত্রিকায় প্রতি মাসে কত নামেরই মিছিল। সে সব লেখকেরা কোথায় হারিয়ে গেছেন, প্রকৃত লেখক বলে শরৎচন্দ্র সময়ের ধোপেও টিঁকে আছেন। সমালোচকরা অবশ্য বলবেন সব কালেই অপ্রধান লেখকের মিছিলে প্রধান লেখকেরাই জ্বলজ্বল হয়ে থাকেন। এবং বুদ্ধিমানরা বলবেন এই অপ্রধান লেখকেরাই সারা বছর পত্রিকার পাতা-ভরানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকেন বলে এঁদের মূল্যও কম নয়। কাজেই মেনে নিতে হয় এই সত্যটাকে। সবাই লেখক নন, কেউ কেউ লেখক।

ছাপাখানা, কাগজ সুলভ হওয়ার সঙ্গে দৈনিক পত্র, সাময়িক পত্রের আবির্ভাবের শুরু এবং তার বিশ্বগ্রাসী চাহিদায় প্রয়োজন পড়ল অজস্র লেখকের, যাঁরা ছোট গল্প—উপন্যাস এবং বিভাগীয় রচনায় সপ্তাহে—মাসে কাগজের উদর পূর্ণ করতে পারবেন। এরি সঙ্গে কমবেশী প্রণামীর ব্যাপারটা যুক্ত থাকার জন্য লেখকেরাও পরিশ্রম করার উৎসাহ দেখালেন।

বলা বাহুল্য রচনার চাহিদা এত বেড়ে গেল যে স্বাভাবিক কারণে তার গুণাগুণের ব্যাপারটাও অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল। বছর বছর এই লেখকেরাই পত্রিকাকে বাঁচিয়ে রাখল। রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে পত্রিকার আভিজাত্য বা শোভা বর্ধনে ব্যবহৃত হলেন মাত্র। প্রবাসী বা ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের পত্রিকা নয়, সে পত্রিকা দুটি ছিল অসংখ্য অপ্রধান লেখকদেরই পত্রিকা। অর্থাৎ ঘুরিয়ে বলতে গেলে এই সব লেখকেরা নিছক পত্রিকা-নির্ভর, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে পত্রিকাকে নির্ভর করতে

হয়নি। কাজেই কোনো পত্রিকা উঠে গেলে বছরের বাঁধা-লেখকরাও উঠে যান, রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রকে ভুলে দেবার সাধ্য কারুর হয়নি।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে লেখক হিসেবে কেউ কী স্বেচ্ছায় অপ্রধান হতে চান? তৎকালে আজকের বিচারে যাঁরা অপ্রধান বিবেচিত হচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সেকালে কম জনপ্রিয় লেখক ছিলেন না। মাসের পর মাস এঁদেরি ধারাবাহিক উপন্যাস পড়বার জন্যে পাঠকেরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতেন। তাহলে কী এটাও প্রমাণিত হচ্ছে, সমকালে জনপ্রিয়তার মাপকাঠিও কী লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের বিচার নয়? অথচ এই হতভাগ্য লেখকদের আর কী করার ছিল। সমসাময়িকতার রুচি তাঁরা মিটিয়েছেন, সানন্দ পাঠকগোষ্ঠীকেও তাঁরা পেয়েছেন। তাঁরা তো তৎকালের পুরস্কৃত লেখক, সমসাময়িকতার দাবি না মিটিয়ে কোন্ লেখকই বা অমরতার প্রত্যাশা করতে পারেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে শরৎচন্দ্র তো তাই করেছেন। সমসাময়িকতার দাবিকে বাদ দিয়ে তিনি চিরন্তনতার কথা ভাবতেই পারেন নি। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িকতার অপেক্ষা সাহিত্যে চিরন্তনতার প্রশ্নটাকেই বড় করে দেখেছেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-ধারণার বিপরীতে তিনি সোচ্চার মত প্রকাশ করেছেন।

জনপ্রিয়তা-নামক বিষয়টা তাহলে কেমন গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না?

ধাঁধাটা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে নিয়েই।

আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র অসামান্য জনপ্রিয়তার অধিকারী হন এবং শতবর্ষ অতিক্রান্ত হলেও তাঁর রচনাবলী বিক্রির যা রেকর্ড তাতে স্বীকার করতে হয় যে বৃহত্তর পাঠকের কাছে তিনি আজো তেমনি জনপ্রিয়। অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত কাব্য-মাধ্যমের কারণেই সেদিন এবং আজো পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের বৃহত্তর পাঠক পাননি। অথচ বাঙলা সাহিত্যে দুজনই প্রধান লেখক। যদিও পাঠকগোষ্ঠীর চরিত্র উভয়েরই সম্পূর্ণ ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের অভিজাত সাহিত্য সাধনা শরৎচন্দ্রের নিম্নবিত্ত পাঠকদের তেমন স্পর্শ করে যেতে পারেনি।

আমরা প্রসঙ্গে ফিরে যাই। এককালের জনপ্রিয় লেখকের আজকের অবজ্ঞাত অদৃষ্টের ঘটনাটাই বিচার করে দেখা যাক। এক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস যে যে গুণগুলি একজন লেখককে যথার্থভাবে তৈরি করে সেই সব গুণের কোনো ত্রুটি রয়েছে রচনায়। হয়তো বিষয়ের প্রতি তেমন বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি দেখাতে না পেরে লেখক শস্তা সেন্টিমেণ্টাল বা অতিরিক্ত ইমোশনাল

হয়ে পড়েছেন। সেন্টিমেণ্টালিটি বা ইমোশনাল বাড়াবাড়ি পাঠকদের চট করে অভিভূত করে। কিন্তু সেই অবস্থাটাও ক্ষণস্থায়ী। এর ফলে যে মেলোড্রামা সৃষ্টি হয় তার প্রভাবও স্বল্প। কিংবা হতে পারে নিছক বর্তুল কাহিনীর ঊর্ধ্বে রচনায় কোনো জীবনদর্শন বা লেখকের ব্যক্তিত্বের পরিচয় নেই।

কিন্তু এই সব যুক্তিও কমজোর মনে হয় যখন শরৎচন্দ্র-সমসময়ের দুজন শক্তিশালী লেখকের কথা ওঠে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজকের বাঙলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে এঁরা অস্পষ্ট হয়ে গেছেন। এঁদের লেখার পাঠক নেই, বাজারে এঁদের বইও পাওয়া যায় না, এবং সাহিত্য সম্পর্কে চিন্তিত দায়িত্বশীল সমালোচকও নেই যাঁরা এ বিষয়ে অজ্ঞানদের অবহিত করতে পারেন। নরেশচন্দ্র সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক লেখক। সেকালে রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র যা পারেননি তিনি বিধবার প্রেম এবং বিবাহ পর্যন্ত সাহিত্যে চালিয়ে দিয়েছিলেন। প্রচলিত সংস্কারকে পযন্ত তিনি সমূলে নাড়া দেবার চেষ্টা করেছিলেন। উপেন গাঙ্গুলির সাহিত্যের সংস্কার দীর্ঘ প্রসারিত জীবনরসের গূঢ় তাৎপর্য ক্লাসিক ভঙ্গিতে তাঁর রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অন্তত আমরা এই লেখকদ্বয়কে অপ্রধান বলে অবনয়ন করতে পারি না। সিরিয়াস পাঠকদের জন্য আজো এঁদের রচনা সুপারিশ করতে পারা যায়।

তাহলে এঁদের এই বিস্মৃত অবস্থার কারণ কী এই যা ক্লাসিক সাহিত্যের অদৃষ্ট। অর্থাৎ ক্লাসিক বলে দূরে সরিয়ে রাখা। বস্তুত পৃথিবী জুড়ে যাদের ক্লাসিক বলা হয় তাদের পুরনো লাইব্রেরির শেল্‌ফে রাখা ছাড়া আর ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে না।

সমস্যাটা ক্রমশ জটিল হয়ে যাচ্ছে ঃ প্রধান-অপ্রধানের প্রশ্নটাও। এক-কালের জনপ্রিয়তা-অপ্রিয়তার ব্যাপারটাও?

তাহলে মহাকালেরই কী নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ আছে? যা স্বেচ্ছাচারী ও খামখেয়ালি প্রকৃতির? নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথিবীর আশ্বাস সত্ত্বেও যা ভবভূতিকে কালিদাসের জনপ্রিয়তার কাছে আসতে দেয়নি। যা বার্নার্ডশকে শেকসপীয়ারের মহিমার কাছাকাছি পৌঁছতে দিল না।

ব্যাপারটাকে এইভাবে ভাবা যায়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বাঙালীর মনে একটা সংস্কারে পরিণত হয়েছে। তাঁদের সাহিত্যিক সত্তা নির্বিশেষে চেতনার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে গেছে। রেডিওর ঘুম ভাঙা থেকে নিদ্রা যাওয়া

পর্যন্ত রবীন্দ্র সংগীতের ব্যাপক প্রচার সুদূর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। শরৎচন্দ্রও তেমনি প্রবাদের মানুষ।

যেভাবে সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে আমাদের সাহিত্য ধারাবাহিক সূত্রে এগিয়ে চলেছিল তা ব্যাহত হয়েছে। তার কারণ দেশবিভাগের মতো একটা অশ্লীল অনৈতিহাসিক ব্যাপার, যা বাঙালীর সুস্থ জীবনযাত্রা ও সাহিত্যবোধে আঘাত হেনেছে। দেশবিভাগের সূত্রেই ওপার বাঙলার মানুষ ছিন্নমূল হয়ে কোনোরকমে জীবনরক্ষার তাড়নায় এমনভাবে নিযুক্ত হয়ে পড়েছেন যে তাঁদের বংশধরেরা চেতনা বাড়ার সঙ্গে জেলখানার মতো বিচ্ছিন্ন কলোনি জীবন পেয়েছে, বাঙালী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সামগ্রিক বোধের সঙ্গে যা যোগাযোগহীন।

যে সব পণ্ডিতেরা এই ছিন্নসূত্রকে যুক্ত করে বাঙালীর চেতনায় উপহার দেবেন তাঁরাও এই ব্যাপারে অমনোযোগী। কাজেই বাঙালী নগদ কারবারের বাইরে আর দৃষ্টি দিতে অভ্যস্ত নন। এবং সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁরা তেমন গুরুত্ব বা গৌরব বোধ করেন না। আজকালকার ছেলে-মেয়েরা পাঠ্যপুস্তকের বাইরে সাহিত্য সম্পর্কে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বোধ করেনা। তাদের ভিন্নতর ঔৎসুক্য আছে যা খেলো রাজনীতি ও অশ্লীল সিনেমায় তৃপ্ত হয়। বুর্জোয়া বাজারে অন্যান্য পণ্যের মতো সাহিত্য এক ধরনের খেলনায় পরিণত হয়েছে। অনেক তরুণদের কাছে এর চেয়েও চিত্তাকর্ষক খেলার সামগ্রী আছে।

এবং যেভাবে সমাজ লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যহীন পথে এগিয়ে চলেছে তারই দর্পণ সাহিত্যে প্রতিফলিত হচ্ছে।

উদ্দেশ্যহীন সমাজ, লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের সঙ্গে পারম্পর্যহীন সাহিত্য পা মিলিয়ে চলেছে।

বামপন্থী লেখকদের অস্তিত্বের সমস্যা

বামপন্থী লেখকদের অস্তিত্ব রক্ষার সমস্যার কথা যখন কেউ ভাবছেন না তখন তাঁদেরি মুখপাত্র হিসেবে সঙ্গত কারণেই কিছু বক্তব্য আমাকে রাখতে হচ্ছে।

প্রথম দৃষ্টিতে বিষয়টি কি বিস্ময়কর বলে মনে হয় না যে, পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ মানুষ রাজনীতিগত ভাবে, বামপন্থী হলেও তুলনায় বামপন্থী সাহিত্য মাতাপিতাহীন অনাথের মতো দৈন্যদশায় কাটাচ্ছে। তার অর্থ তুরকম হতে পারে। এক, বামপন্থী রাজনৈতিক মানুষ সাহিত্যের সঙ্গে কোনো প্রয়োজনীয় সম্পর্ক বোধ করেন না। তুই, সাহিত্যের ব্যাপারটাও যে রাজনীতির সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে যুক্ত থাকা দরকার, এই জ্ঞানটাই তাঁদের নেই।

কারণ যাই হোক, বিষয়টা সত্য যে, বামপন্থী রাজনীতি যেমন নির্দিষ্ট পোলারাইজেশনের দিকে এগোচ্ছে, বামপন্থী সাহিত্য তার সঙ্গে কোনো তাল রাখতে পারছে না। অথচ, কে এ কথা অস্বীকার করবে, সামাজিক পরিবর্ত্তনের ভূমিকায় রাজনীতির সঙ্গে সাহিত্যেরও বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে ভূমিকা রাজনীতি অপেক্ষাও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু সাহিত্য মন আর বুদ্ধিকে প্রস্তুত করে। ইতিহাসের সাক্ষ্য নিলে দেখা যাবে সাহিত্যই সমাজ পরিবর্ত্তনের নান্দী শুরু করে। ফরাসী বিপ্লব হোক, রুশ বিপ্লব হোক, কী চীনা বিপ্লব হোক—তার অব্যবহিত কালে সাহিত্যের দায়িত্ব কে অস্বীকার করবে!

বয়সের হিসাবে আমাদের দেশে বামপন্থী চিন্তা তথা আন্দোলন নেহাত কম দিনের নয়। চল্লিশে কী পঞ্চাশের পর্বে বিশেষ করে সাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি দৃকপাত করা যায় তাহলে দেখা যাবে সেকালে সমগ্র সাহিত্য আন্দোলনে বামপন্থী লেখকেরাই নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। এবং সেদিনের 'পরিচয়' 'অরণি' 'অগ্রণী' 'নতুন সাহিত্য' প্রভৃতি মুখপত্রগুলিতে এই দৃষ্টিভঙ্গির লেখকেরাই সাহিত্যের বাতাবরণকে জুড়ে রেখেছিলেন। সে সময় মুষ্টিমেয় প্রতিক্রিয়াশীল লেখক সমাজে তেমন মাথা তুলতে পারেন নি। সাহিত্যের পাঠকও যেমন বামপন্থী, লেখকও তেমনি বামপন্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-তুর্ভিক্ষ-দাংগা-দেশ-

বিভাগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজো খুঁজতে গেলে এই লেখকদের অজস্র গল্প-উপন্যাসের দরজায় আসতে হবে!

কোন্ লেখকের নাম করব? মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আছেনই। আছেন রমেশচন্দ্র সেন, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, সুশীল জানা, ননী ভৌমিক। তরুণদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, আশীষ বর্মণ, মিহির সেন, শ্রীকৃষ্ণ গোস্বামী, শান্তি রায়, সুলেখা সান্যাল, কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যপ্রিয় ঘোষ, সুবোধমোহন ঘোষ, মনোজিৎ সেন প্রমুখ। এই তরুণ গোষ্ঠী আমার সমবয়সী বলে তাঁদের সঙ্গে আমার মানসিক সাযুজ্য রয়েছে। অগ্রবর্তী লেখকেরা আজ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার সমকালীন লেখক-দের ব্যাপারটাই মর্মান্তিক। আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি আজকের পাঠক অনেকেই এই লেখকদের কোনো পরিচয়ই রাখেন না। অথচ এঁরা সেকালে কত সংখ্যাতীত উজ্জ্বল ছোট গল্প লিখে গেছেন, যা আজো বাঙলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত হবার স্পর্ধা রাখে।

অতঃপর ভাবতে হবে এই প্রতিভাবান লেখকেরা কেমন করে হারিয়ে যেতে পারলেন! এই বেদনাদায়ক ঘটনার জন্যে দায়ী কী তাঁরা নিজেরাই? কিংবা অন্য কিছু কারণ?

আমার মনে হয় যত শক্তিশালী লেখকই হোন্ তিনি যদি নিজেকে প্রকাশ করবার মাধ্যম না পান তাহলে তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাও একদা ক্লান্ত হয়ে পড়তে বাধ্য। সেদিন এবং আজো এমন কোনো সংগঠিত প্রচেষ্টা নেই যা এগিয়ে এসে এঁদের পত্রিকার ফসলগুলোকে স্থায়ী গ্রন্থের প্রচ্ছদে ধরে রাখতে পারে। দুঃখের বিষয় সেকালে এবং একালেও রাজনৈতিক পুস্তিকা প্রকাশ করবার বামপন্থী প্রকাশনা ছিল বা আছে, কিন্তু সাহিত্যের জন্যে তাঁদের বিন্দুমাত্র শিরঃপীড়া নেই। অথচ ভাবলে অবাক হতে হয়, এই লেখকেরা ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরি করবার জন্যে সাহিত্যে আসেন নি, তাঁরা রাজনৈতিক কর্মীর মতোই আদর্শবান তথা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ তো বটেই। এঁদের এই আদর্শের দাম কোনো সংগঠিত মহল থেকেই পাওয়া গেল না। তবু যে দু'চারজনের বই বেরিয়েছে তা কতকগুলি অ্যামেচার বন্ধুভাগ্যের জোরে। তা না হলে ননী ভৌমিক কি সুশীল জানার নামও আজ হারিয়ে যেত।

এই হারিয়ে যাওয়া লেখকদের সমর্থনে আমি আজ গোটা বামপন্থী আন্দো-লনকেই অভিযুক্ত করতে চাই। আজো পর্যন্ত এমন অপমৃত্যু যে কত চলেছে

নিত্য এই তরুণ লেখকদের সঙ্গে কাটাতে হয় বলে আমার চেয়ে তার হিসাব কে বেশি জানে।

আমার মনে হয় বামপন্থী শিবিরে এটা একটা স্থায়ী ব্যাধি। তার সম্ভাব্য কারণ বামপন্থী আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন তাঁরা সাহিত্যের বিষয়টার ওপর উপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন না। সাহিত্যকে বর্জন করেই তাঁরা হয়তো রাজনীতিতে কেল্লাফতে করবেন ভাবেন।

অথচ তাঁদের কেন এই দৃষ্টির সংকীর্ণতা, এতে কোন পক্ষের লাভ হয়, তাও বুঝতে পারিনে। একটা রাজনৈতিক সংগঠনে তার সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কী অপরিসীম দায়িত্ব, একথা না বুঝে আমরা প্রতিক্রিয়াশীলদের সংগঠিত অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শক্তিশালী বিকল্প রাখতে পারব না।

সাম্প্রতিক একটি সাহিত্য সভায় প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল লেখকদের দৃষ্টান্ত রাখতে গিয়ে আমাকে যথেষ্ট ঘর্মাক্ত হতে হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রয়াসে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, কী চিত্ত ঘোষাল, কিংবা কালিদাস রক্ষিত বা তরুণতম উজ্জল চক্রবর্তী তাঁদের বই রাখতে পেরেছেন। কিন্তু তাঁদের এই ব্যক্তিগত প্রয়াসই বা কতদিন চলবে, যতদিন না এর পিছনে সংগঠিত দায়িত্ববোধ থাকে। নামোল্লেখ না করেও বলা যায় সাম্প্রতিককালে বহু শক্তিমান তরুণ কেবল প্রকাশিত হতে না পারার ব্যর্থতায় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন।

অবস্থাটা আয়ত্তের বাইরে যাবার আগেই আমি সেইসব রাজনীতি সচেতন প্রকাশকদের দরবারে আর্জি জানাচ্ছি, আপনারা এগিয়ে আসুন, সাহিত্যকে বাদ দিয়ে রাজনীতিতে জয়লাভের স্বপ্ন ছাড়ুন। সাহিত্যকর্মী হিসাবে আমার সাথী লেখকদের হয়ে আমি আশ্বাস দিচ্ছি, রাজনীতি ও সাহিত্যের এই আবশ্যিক বন্ধন সমগ্র বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষেই স্বাস্থ্যকর হবে।

প্রগতি সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গি

বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার সবটা পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, ফুল চন্দন অগুরু দিয়ে দুর্গন্ধটা চাপা দেবার চেষ্টা যতই করুণ লাগুক স্থিতস্বার্থের সাহিত্যিকরা সেই কাজই করে চলেছেন। এই সাহিত্যের লক্ষণ নিশ্চিতই ডেকাডেণ্ট। সমাজ শরীরের এই মৃত্যুর সংবাদটাকে পাঠকদের কাছ থেকে আড়াল করবার জন্য তাঁরা সমাজ-বহির্ভূত ব্যক্তিকেন্দ্রিক গল্প-উপন্যাস ফেঁদে বসেছেন। তাঁরা ভালো করেই জানেন বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা তার উৎপাদনক্ষমতা হারিয়ে অর্থহীন কংকালের মতো কোনোরকমে খাড়া হয়ে আছে। চতুর লেখকেরা এই তাৎপর্যহীন সমাজ এবং তাকে কেন্দ্র করে কোনো রকমে বেঁচেবর্তে থাকা সাহিত্যের পরিণতিও ভালো করে জানেন।

সমাজব্যবস্থার উপযোগিতা হারালে তার সাহিত্যও মূল্যহীন হয়ে পড়ে। তখন সেই পচাগলা সাহিত্য মৃত সমাজেরই বিলাপে পরিণত হয়। বুর্জোয়া সাহিত্য আজ সেই স্তরেই পৌঁচেছে। সাহিত্যের যে একটা সামাজিক দায়িত্ব থাকে সে-দায়িত্ব থেকে স্খলিত হয়ে শূন্য অবস্থায় শেকড়হীন সাহিত্য ঝুলতে থাকে। এবং বাজারের দশটা অপ্রয়োজনীয় পণ্যের মতো সাহিত্য বাজারে পচতে থাকে। কেউ কেনে, কেউ কেনে না, কিন্তু কেউই সে-সাহিত্যকে মহৎ বলে মনে করে না।

বুর্জোয়া সাহিত্য ক্ষয়ের দর্শন আউড়ায়, কিন্তু ক্ষয় তো কোন সৎ সাহিত্যের উপজীব্য হতে পারে না। ক্ষয়কে চটকদার করে বাজারে বের করলে সাময়িক-ভাবে কিছু অন্যমনস্ক পাঠকের পকেট কাটা যায়। সাহিত্য তার গৌরব পায় না।

সাহিত্যকে প্রয়োজনীয় করতে হলে সমাজের সেই প্রগতিশীল অংশ যাঁরা পুরনো সমাজব্যবস্থাকে কবরস্থ করে নতুন সমাজব্যবস্থার হদিশ দিতে পারেন তাঁদের সঙ্গেই সাহিত্যকে যুক্ত হতে হবে। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার ধ্বংস নিশ্চিত করতে রয়েছেন জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণী ও তাঁর দর্শন। প্রগতিশীল লেখককে তাঁদের দলেই ভিড়তে হবে।

এই দর্শনে উদ্বুদ্ধ প্রগতিশীল লেখক শুধু ফ্যাশানের মতো মৃত সমাজ

ব্যবস্থার ক্ষয়ের ছবিই আঁকবেন না, কারণ তিনি জানেন ক্ষয়ের পাশাপাশি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ার কাজও চলেছে। কাজেই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টাতে হবে। তার জন্যেই দরকার শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের আত্তীকরণ।

স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাহিত্যে দুটো শিবির স্পষ্ট ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আমরা প্রগতিশীলরা এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন না হলেও প্রতিক্রিয়াশীলরা এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ সজাগ। তাঁরা প্রগতিকে রুখতে শুধু 'কী লিখব' না 'কাদের দিয়ে' লেখাব—সে বিষয়েও হুঁশিয়ার। মূলত সাম্যবাদ বিরোধিতা তাঁদের যেমন লক্ষ্য তেমনি সাম্যবাদ বিরোধী লেখকদেরও তাঁদের দলবদ্ধ করা দরকার, যে কাজ তারা ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন। তাঁদের কাগজে লাল-মার্কা লেখা বা লেখক পুরোপুরি নিষিদ্ধ, সেই লাল লেখক যতই শক্তিমান হোননা তাঁর স্থান সেখানে নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেখানে কোনো লালের চিহ্নও যদি পাই তাহলে বুঝতে হবে ছদ্মবেশ। মুখোশ সেখানে মানুষকে ঠকাবার কাজেই ব্যবহৃত হয়েছে। আসল কথা সেই লাল লেখক এখন কি লিখছেন, কাকে সেবা করছেন সেটাই বিচারের মুখ্য। তিনি কখনো কখনো রাজনৈতিক গল্প লিখে পাঠককে চমক দিলেও সে রাজনীতি যে মূল শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকেই খারিজ করে দিচ্ছে সে-কৌশলকেও ধরে ফেলতে হবে। তিনি বিপ্লবের মতো আমূল দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের ব্যাপারের তাৎপর্যে না গিয়ে লেখেন বিপ্লবে কীভাবে "নির্দোষ লোকের" প্রাণ যায় কিংবা পার্টির বুরোক্রাসির ক্লিক্ কীভাবে দলভুক্ত কর্মীর হত্যা ঘটায়, ইত্যাদি। আসলে বুর্জোয়ারা বিপ্লব মানে যেমন হত্যা, রক্তারক্তি ব্যাপার বলে চেঁচায়, এই লাল লেখকটি তেমনি কৌশলে বিপ্লবের মতো মহৎ ব্যাপারকে পিছন থেকে ছুরি মারে!

শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী লেখক মূল শ্রেণী সংগ্রামের বাস্তব ব্যাপারটাকে কখনোই ঘুলিয়ে ফেলেন না। তিনি বিপ্লবকে আন্টিসোস্যালদের উদ্দেশুহীন খুনোখুনির বিষয় বলে মনে করেন না। বস্তুত কমিউনিস্টদের মতো সত্যিকার হিউম্যানিস্ট কারা? যাদের স্বার্থ সমাজের শতকরা নব্বুই ভাগ শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে। বুর্জোরা সমাজে শতকরা দশ ভাগ লোক নব্বুই ভাগের উপর কর্তৃত্ব করে। দশ ভাগের থেকে নব্বুই ভাগের দাবিই যে ন্যায়সঙ্গত এ সত্য কে অস্বীকার করবে?

এখন শ্রমিক শ্রেণীর দর্শন বলতে আমরা প্রগতিশীলরা যেন যান্ত্রিক কোনো

ধারণা করে না বসি যে, শ্রমিক চাষী নিয়ে লিখলেই প্রগতি সাহিত্য গড়ে উঠবে। *ব্যাপারটা এতো খেলো নয়। আসলে যে-বিষয় নিয়েই লিখি তা* যেন শ্রমিক শ্রেণীর দার্শনিক আলোকে মজবুত হয়ে ওঠে। বিষয় বুর্জোয়া, দালাল, যাই হোক না কেন, সে সব চরিত্রের বিশ্লেষণ শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের আলোকে হবে। অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গিটি শ্রমিকের, বুর্জোয়ার শ্রেণী সমন্বয়মাখা সহানুভূতি জড়ানো নয়।

বুর্জোয়া লেখক এবং প্রগতিশীল লেখক একই বিষয় নিয়ে লিখতে পারেন। ধরা যাক বিষয় হল একজন ভূস্বামী কিংবা শিল্পপতি। দুই লেখকই প্রচার করতে পারেন তাঁদের লেখা যথার্থ অবজেকটিভ, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির মূলত পার্থক্য থাকার জন্য উভয়ের লেখাই বিপরীত হবে। বুর্জোয়া লেখক ভূস্বামী বা শিল্পপতির নানাবিধ গুণকীর্তন করতে করতে তাদের সামাজিক প্রতিপত্তি যে চাষী বা শ্রমিকের শ্রমশক্তি অপহরণ করেই গড়ে উঠেছে সেটাকে আড়াল করে পাঠকের তার প্রতি সহানুভূতি জন্মে দেয়। অন্য দিকে প্রগতিশীল লেখক তার শোষণের মূর্তির সঙ্গে যাবতীয় কাজের বিশ্লেষণ করেন। গরিবের প্রতি এই দুই শ্রেণী-চরিত্রের যে-বাৎসল্য তা যে ভাঁওতা অর্থাৎ অধিকাংশ লোককে চিরকালের মতো 'গরিব বানাবার কল' এ ছাড়া কিছু নয়। সামাজিক সম্পদকে কুক্ষিগত করে রেখেই তো এঁরা বেশির ভাগ লোককে সম্পদহীন দরিদ্র করে রেখেছে। প্রগতিশীল লেখক এই ভাঁওতাটাকে গরিবের চোখে ধরিয়ে দেন।

প্রগতিশীল সাহিত্যের যান্ত্রিক ধারণার বিষয়টির উপর আমি পুনরায় জোর দিতে চাই। এ দেশের প্রগতিশীল রাজনীতির যথেষ্ট বয়স হয়েছে। সে তুলনায় সাহিত্য তেমন মজবুত হতে পারেনি। তার কারণ সাহিত্যের ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দেয়া হয়নি। প্রথমাবধি কী করে ধারণা হয়ে গেল প্রগতি সাহিত্য মাত্রই চাষীমজুর এবং চাষীমজুর মাত্রই জঙ্গী। এই সংস্কারে ভর করে প্রগতির নাম করে সাহিত্যে ছক-বাঁধা জঙ্গী চাষী মজুরকেই প্রাধান্য দিলাম। অথচ শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের অর্থ চাষীমজুর মাত্রই জন্মগত সূত্রে আয়ত্ত করে নিয়েছে তা নয়। তাঁদেরও সচেতন হয়ে এই দর্শনকে আয়ত্ত করতে হয়। যেহেতু পেটিবুর্জোয়া দর্শনের প্রভাব চাষী মজুরদের মধ্যেও রয়েছে। তাই সদর্থে তাঁদের 'মব' নয়, 'প্রলেতারিয়েত' হতে হয়। চাষী-মজুরদের জীবন যাত্রার সঙ্গে যাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে তাঁরাই এই সত্য

স্বীকার করবেন। 'মব' আর 'প্রলেতারিয়েতে' তফাত আছে। রাজনৈতিক শিক্ষা অর্জন করেই 'মব' 'প্রলেতারিয়েতে' পরিণত হন।

অথচ এই সত্যকে অস্বীকার করে শ্রমিক-চাষী মাত্রকেই যখন আমরা সাহিত্যে জঙ্গী করে আঁকি তখন সে সাহিত্যের পায়ের নিচে মাটি থাকে না এবং এ জাতীয় কৃত্রিম লেখা কাউকেই উপকৃত করে না। কেবল মধ্যবিত্ত লেখকদের সদিচ্ছারই প্রতিচ্ছায়া হয়।

সাহিত্যে শুধু নয়, রাজনীতিতেও এই ভাবে শ্রমিক চাষীকে দেখার কারণে আমাদের আন্দোলন দুপয়সা পাইয়ে দেয়ার বাইরে যথার্থ রাজনৈতিক আন্দোলন হয়ে ওঠে না। পেটিবুর্জোয়ার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।

আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্য যে প্রতিষ্ঠিত বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহ্যের কাছে নিষ্প্রভ ঠেকছে তার কারণ বিষয় সম্পর্কে আমাদের যান্ত্রিক ধারণা— রচনায় বিশ্লেষণ কিংবা জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে আমরা পারছি না। বারবার শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের ব্যাপারটার সঙ্গে শ্রমিক-চাষীর সম্পর্ক ব্যাখ্যা-হীন ধরতাই বুলির বশবর্তী হচ্ছে এবং এ সাহিত্য যাঁদের জন্যে উৎসর্গীকৃত, তাঁরা দস্তুরমতো শিক্ষিত হলে, এতদিনে আবর্জনার মতো তা ছুঁড়ে ফেলতেন— কারণ এ লেখায় তাঁদের মানসিকতা কিংবা মনস্তত্ত্ব কোনোটারই প্রকাশ নেই। আমাদের লেখকেরা বেশির ভাগ মধ্যবিত্ত, শহুরে শিক্ষিত। প্রগতি সাহিত্য অর্থাৎ প্রকৃত অর্থে প্রলেতারিয়েত সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম হচ্ছেন না। জাগ্রত শ্রমিক শ্রেণীর সেবা করতে গেলে মনেপ্রাণে চাষামজুর বনে যেতে হবে। এর জন্য শুধু রাজনৈতিক দীক্ষা নিলেই যথেষ্ট হবে না। সৃজনশীল সংবেদনশীল মানুষ হতে হবে এবং দীর্ঘকাল অনুশীলনও করতে হবে। বরঞ্চ অভিজ্ঞতা যদি অতদূর প্রসারিত না হয়ে থাকে তাহলে জানা জীবনকে নিয়েও প্রগতি সাহিত্য করা যেতে পারে, যদি সেখানেও শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে কাজে লাগানো যায়। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তের ভবিষ্যতও তো শ্রমিকশ্রেণীর বিজয়-লাভের ওপরই নির্ভর করছে।

আন্দোলন-বিষয়ক লেখা

চক্ষুষ্মান সচেতন মানুষ মাত্রই স্বীকার করবেন আমরা এক চূড়ান্ত সংকটের মুখে এসে পড়েছি। হয় এই সংকটকে অতিক্রম করবার সচেতন প্রয়াস করতে হবে নতুবা এই সংকট আমাদের ধ্বংস করে দেবে।

এই সংকট-চেতনা যে শুধু রাজনৈতিক পেশাদারদের মধ্যেই আটকা থাকবে, আর ব্যাপক মানুষ তাঁর নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবেন, বিষয়টা এত সোজা নয়।

বিশেষ করে এ-ব্যাপারে সাহিত্য-কর্মীদের দায়িত্ব লঘু করে দেখা যায় না। যেহেতু তাঁরা সামাজিক বিবেকের জিম্মাদার এবং ক্রান্তদর্শী বলে কথিত। মানুষের মন নিয়ে প্রধানত তাঁর কারবার বলে মনোজগৎকে গড়ে তোলার নির্দিষ্ট ভূমিকাও রয়েছে।

অথচ নির্বিচারে যে ধরনের লেখা হামেশা বাজারে বেরিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় না এই সামাজিক সংকটের বিন্দুমাত্র প্রতিফলন লেখকদের চিন্তায় প্রবেশ করতে পেরেছে। প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের কথা ছেড়ে দিলাম, তাঁরা সমাজ-বিষয়ক চিন্তা আদৌ করেন না। কারণ তাঁরা তো পাঠকের জন্যে লেখেন না, তাঁরা লেখেন নিজেদের জন্যে, জীবনকে আবিষ্কার করার জন্যে! তাঁদের এই 'আত্মচরিত' এবং 'জীবন-আবিষ্কারের' মোদ্দা ফল কী, তাঁদের সাহিত্যেই তা ধরা পড়ে।

কথা হচ্ছে সমাজসচেতন দায়বদ্ধ লেখকদের সম্পর্কে। তাঁরাও কী সংকটের ভয়ংকর চেহারাটা ধরতে পারছেন? কোথায়? সাম্প্রতিককালে একটি রচনাও তো গভীর ভাবে দাগ কেটে যেতে পারছে না! একালের তরুণেরা কিসের প্রেরণায়, কোন্ আদর্শকে অবলম্বন করে লেখেন তাও ধরতে পারিনে। অথচ পত্র-পত্রিকায় অনর্গল লেখা বেরিয়ে যাচ্ছে। যেগুলি না-লিখলেও খুব ক্ষতি ছিল না।

মুশকিল হচ্ছে লেখা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু লেখক গড়ে উঠছে না। কারণ অসুখটা মূলেই। কে আমায় মাথার দিব্যি দিয়েছে লিখতে তা নিজেই আমি জানিনে।

কেন লিখছি ?

ছাপা হচ্ছে যে !

মানে, তাঁদের বিবেচনায় যা ছাপা হচ্ছে তা-ই লেখা।

অথচ, তাঁরা জানেনও না আজকের দিনে লেখা এবং লেখক হওয়া সমান শক্ত। স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতার কথা বলতে পারলেই সহজেই লেখক হওয়া যেত। বিয়াল্লিশের আন্দোলন, অগ্নিযুগের আন্দোলন নিয়ে লিখতে পারলেই মোটামুটি লেখক হওয়া যেত। এখন স্বাধীনতা পেয়ে গেছি, সুতরাং আন্দোলন-জাতীয় লেখার আর প্রয়োজন নেই !

কিন্তু স্বাধীনতার ত্রিশ বছর পরেও কী আন্দোলন-পর্ব একেবারেই চুকে বুকে গেছে ?

না, চুকে যায় নি। তাই আন্দোলনের কাহিনী লিখতে গিয়ে সচেতন লেখকেরা অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। ট্রেড ইউনিয়নের লড়াই, চাষির জমি দখলের লড়াই—এ সবই লেখায় স্বাভাবিক প্রাধান্য পেয়েছে।

এই জাতীয় লেখা যে অতীতে উৎরে যায় নি এমন নয়। কিন্তু আজকাল লেখকেরা যখন এই বিষয় নিয়ে লেখার চেষ্টা করেন তখন তাঁরা অতীতের ভূতকে কাটাতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। এই লেখাগুলো মানবমনের কারবারী লেখকের নয়, রাজনৈতিক কর্মীর। লেখায় শ্রমিকের মানসিকতার নাম-গন্ধ নেই, আছে কতকগুলো রাজনৈতিক স্লোগান। অর্থাৎ কারখানায় ধর্মঘট ইউনিয়নের দ্বারা কী ভাবে গঠিত হয়, কীভাবে শ্রমিক 'লড়াই' করে, তার ধরতাই কতকগুলো ছাঁচ আছে। কিন্তু ধর্মঘটী শ্রমিকের মানসিকতা, তাঁর মনস্তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা নেই। ব্যাপারটা এমন যেন শ্রমিক মাত্রই জঙ্গী, তাঁর মধ্যবিত্তসুলভ দোদুল্যমানতা নেই, তার রাজনৈতিক দীক্ষা গ্রহণেরও প্রয়োজন নেই। ফলে ইউনিয়নের তথাকথিত জঙ্গী শ্রমিক দেশে মাস মাইনে পাঠিয়ে কয়েক কাঠা জমি কেনে, বাড়িতে পুজো-আচ্চা উৎসব-পালাপার্বণ সবই চলে। এমনকি আপিসে সুদের কারবার করতেও তার আটকায় না। অন্য-দিকে চাষি জীবন সম্পর্কেও একই সত্যি।

কথাটা হচ্ছে সচেতনভাবে রাজনীতিতে দীক্ষা দিতে না-পারলে চাষি-শ্রমিকও একই পেটি বুর্জোয়া অসুখে ভোগে।

তা আমাদের আন্দোলন-বিষয়ক লেখকেরা কি এই জটিল সমস্যার কথা

একবারও ভাবেন? ভাবার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কারণ তার আগেই তাঁরা 'লেখক' হয়ে যাচ্ছেন। লেখা ছাপাও হয়ে যাচ্ছে।

আগেই বলেছি ছাপা মাত্রই 'লেখা' নয়, লেখা ছাপা হলেই 'লেখক' হওয়া যায় না।

কেউ কেউ অন্ধভাবে গর্কির 'মাদার'-এর অনুসরণ করেন। ভুলে যান ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনেরও বয়স হয়েছে। সংকট এমন তীব্র যে অর্থনৈতিক কনসেশন আদায়ের এই কায়দাও বহু ব্যবহারে ভোঁতা হয়ে গেছে। একথা ঠিক, বুর্জোয়ারা যতদিন সামর্থ্য কিছু কনসেশন দিয়ে তাঁদের প্রভুত্ব টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় মালিকেরা যদৃচ্ছ লক-আউট কিংবা লে-অফ করে যাচ্ছে। মাসের পর মাস শ্রমিকেরা অমানুষিক পীড়নের শিকার হচ্ছেন। জনপ্রিয় সরকারও যে সব সময় মালিকদের বাধ্য করতে পারছেন এমন নয়।

গর্কি তাঁর সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এই পরিণতি ভাবতে পারেন নি।

বাধ্য হয়ে নেতাদেরও বলতে হচ্ছে ধর্মঘট এড়াতে হবে, এটা শ্রমিকের শেষ অস্ত্র হোক। রাজনৈতিক নেতারা আজ যা ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন লেখককেও তাঁর গতানুগতিক আন্দোলন বিষয়ক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন করতে হবে। শুধু মাইনে বাড়ানোই নয়, তাঁর আন্দোলনকে সামাজিক অর্থনৈতিক আন্দোলনের লক্ষ্যে নিয়োজিত করতে হবে, যা ব্যাপক ক্ষমতা দখলের অঙ্গীভূত। তা না হলে আজকের দিনে এ বিষয়ে লেখা সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। মজুরি বাড়ানো অপেক্ষা এই লক্ষ্যে শ্রমিক-মনকে সচেতন করাই বেশি প্রয়োজন। অর্থাৎ এই লেখার একমাত্র স্লোগান 'শ্রম যাঁর শিল্প তাঁর' 'লাঙ্গল যাঁর জমি তাঁর'।

অবশ্যই এটা রাজনৈতিক লড়াই। দীর্ঘস্থায়ী।

লেখক অবশ্যই শ্রমিকের মনকে পূর্বাহ্নেই প্রস্তুত করতে পারেন। এইটেই লেখকের আদর্শগত দিক।

প্রগতি সাহিত্য : আনুষঙ্গিক কিছু চিন্তা

সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী লেখকের শুধু সৎ হলে চলে না, তাঁকে সচেতন হতে হয়। কারণ সকলেই জানেন সততা একটা মানবিক গুণ হলেও তার ক্রিয়াশীলতার কোনো লক্ষণ নেই। সচেতনতার একটা কার্যকারিকতার দিক আছে। এটা কোনো বায়বীয় ব্যাপার নয়। পরিবর্তনে ইচ্ছুক লেখককে এই সচেতনতা দিতে পারে মার্কসীয় জ্ঞান। এই শ্রেণীর লেখকের সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় এই জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী। তারি জন্যে লেখককে মার্কসীয় 'দর্শন' আয়ত্ত করতে হয়। একই ক্ষেত্রে রাজনৈতিককর্মী কোনো কোনো সময়ে ইস্যু বিশেষে 'কৌশলগত' কারণে এমন এমন কাজ করেন যা আপাতদৃষ্টিতে মার্কসবাদের বিপরীত বলে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই 'কৌশলগত' সুযোগ নেবার প্রশ্নই ওঠেনা এবং অবকাশও নেই। মার্কসীয় দর্শনে অভিষিক্ত লেখকের এই চৈতন্য তার সমগ্র সাহিত্য জীবনের পাথেয়। এই চৈতন্যে-স্নাত লেখকের কোনো সৃষ্টিই কোনো কালে পরিবর্তন বা সংশোধনের অপেক্ষা রাখেনা।

কাজেই মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিককর্মী ও সাহিত্যকর্মীর লক্ষ্য মূলত এক হলেও কাজের পদ্ধতি আলাদা। এমনকি সাহিত্য কর্মী যদি একই সঙ্গে রাজনৈতিককর্মীও হন তাহলেও তাঁকে এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হয়। কারণ সাহিত্যকর্মের একটি সৃজনশীলতার দিক আছে।

এদেশে যত তাড়াতাড়ি রাজনৈতিককর্মীতে উন্নীত হওয়া যায় সৃজন-শীলতার ব্যাপারটা রয়েছে বলেই তত জলদে সাহিত্যকর্মী হওয়া যায় না। আমাদের তথাকথিত লেখকেরা যতটা রাজনীতিতে পাঠ নেন ততটা সাহিত্যিক হয়ে ওঠার জন্যে সময় দিতে বা অনুশীলন করতে রাজি নন। এই ভিন্ন ক্ষেত্রের বোধটুকু সঠিক জানতেন বলেই লেনিন রাজনৈতিককর্মী, গর্কি সাহিত্যকর্মী।

আমাদের এই তথাকথিত লেখকেরা রাজনীতি ও সাহিত্যের ভিন্ন ক্ষেত্রটি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না-হওয়ার জন্যেই বেশিরভাগ রচনায় রাজনৈতিক স্লোগান থাকলেও সাহিত্যের নিজস্ব ব্যাকরণে তা সিদ্ধ হয়ে ওঠে না। এবং

বিশেষ রাজনীতি-সচেতন মানুষের বাইরে বৃহত্তর মানুষের মনোভূমিতে তা বিন্দুমাত্র ছায়া ফেলতে পারেনা। এমন কি কাহিনীর বিষয় রাজনৈতিক হলেও নয়। প্রকৃষ্ট উদাহরণ গর্কির 'মাদার', অবশ্যই রাজনৈতিক উপন্যাস। কিন্তু লেখক সরল, অজ্ঞ মায়ের ক্রমিক চেতনার মাধ্যমে যে রাজনৈতিক উন্মেষ ঘটিয়েছেন তা মনোভূমিকে প্লাবিত করে সাহিত্যের যথাযথ উদ্দেশ্যকে সার্থক করেছে। বলাবাহুল্য অচেতন মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিলেই সে বিপ্লব করেনা যতক্ষণ না তার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠছে। সাহিত্যের একমাত্র কাজ মানুষের মনকে, তার মস্তিষ্ককে তৈরি করে তোলা।

সেই কারণেই সাহিত্যের দায়িত্ব গুরুতর। এবং তাকে সাফল্যের সঙ্গে মানুষের চৈতন্যের সঙ্গে গ্রথিত করার কাজও ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই গুরুত্বের দিকটি প্রায়শই অবহেলিত হয় বলেই রাজনৈতিক কর্মী হলেই তিনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বেমালুম ছাড়পত্র পেয়ে যান। তাঁর লেখা পত্রপত্রিকায় বেরোয় এবং তিনি লেখক হয়ে যান। কিন্তু সত্যিই যদি আমাদের আত্ম-সমালোচনার সদিচ্ছা থাকে তাহলে দেখতে পাবো নিরানব্বুই পার্সেণ্টও আমরা লেখক হইনি। পত্রিকায় গুচ্ছের লেখা বেরোলেও নয়।

এই বেদনাদায়ক অবস্থাটা কেন? তার কারণ আমার মনে হয় আজো পর্যন্ত সাহিত্যকর্মীকে রাজনৈতিককর্মীর মতো গুরুত্ব দেওয়া হয় না। নেতা-ব্যক্তিরা এমনও রায় দেন, সাহিত্য করে কিছু হবে না, করার দরকারও নেই। তাই সাহিত্যের জগৎটা অবহেলিত, উপেক্ষিত, এবং অনুশীলনহীন দায়েসারা গোছের। সাহিত্য পত্রিকাও হয়ে পড়ে রাজনীতিসর্বস্ব। ক্ষতি হয় সমূহ সাহিত্য ক্ষেত্রের। অ্যামেচারিস, অর্বাচীন, শিক্ষানবীশের পরস্পর গা শোঁকা-শুঁকির কাণ্ডকারখানা। আর, সেই সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকেরা তামাম ভালোমন্দ পাঠকের টেবিল জাঁকিয়ে বসেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পোলারাই-জেশন সত্ত্বেও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাঠক বিপরীত আচরণ করেন। অর্থাৎ যিনি রাজনীতির ডাকে লড়াইয়ের ময়দানে সামিল হন তিনি ফেরার পথে একটি সিনেমাপত্র কিনে বাড়ি ফেরেন। এমনকি প্রসিদ্ধ বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর মুখে আমি স্বকর্ণে শুনেছি সাহিত্যের জন্যে 'দেশ' না পড়ে উপায় নেই। তাঁর এই নিরুপায়তা দেখে আমার কষ্ট হয়েছিল।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ব্যাপক অন্যমনস্কতার কারণে প্রগতিশীল সাহিত্য যা হওয়া ছিল, হয় নি। তার প্রধান কারণ সাহিত্যের ভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে অনবহিত

নিছক রাজনৈতিক কর্মীর অব্যাপারে হস্তক্ষেপ। দ্বিতীয়ত. সৃজনশীল ক্ষমতার দুর্ভিক্ষ। তৃতীয়ত, মার্ক্সীয় দর্শন সম্পর্কে দুস্তর অজ্ঞানতা।

এই দর্শনের ওপর আমি সবিশেষ জোর দিতে চাই। রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে এই দার্শনিক উপলব্ধি সম্যকভাবে না থাকলেও বিভিন্ন রাজনৈতিক নির্দেশ পালনে তার অসুবিধে হয় না। কিন্তু সাহিত্য কর্মীর ক্ষেত্রে এই উপলব্ধি আবশ্যিক। কারণ সাহিত্য কর্মের সঙ্গে তা অনিবার্যভাবে জড়িয়ে থাকে। এর সঙ্গে লেখকের জীবনদর্শন তথা ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শুধুমাত্র রাজনৈতিক নির্দেশাবলীকে উপজীব্য করে তুললে কোন কারণে 'নির্দেশ' পরবর্তীকালে 'ভ্রান্ত' প্রমাণিত হলে লেখককে তার লেখা তুলে নিতে হয় অথবা পরিবর্তিত অবস্থায় সংশোধন করতে হয়। প্রমাণ স্বরূপ সুভাষ মুখুজ্যেকে একদা মাও সে তুঙের উপর কবিতা লিখে পরবর্তীকালে তার সংশোধন করতে হয়। কিম্বা গোলাম কুদ্দুসকে জনৈকা কৃষক আন্দোলনের নেত্রীকে 'স্তালিন নন্দিনী' আখ্যা দিয়ে 'নিস্তালিনী' পর্বে চুপ করে যেতে হয়। রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে এইভাবে যদি লেখককে রচনা পালটাতে হয় তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই রকম যে লেখকের উচ্চারণ আন্তরিক নয়, রাজনৈতিক উচ্ছ্বাসগ্রস্ত। অথচ মূল দর্শন সম্পর্কে তাঁরা যদি অবহিত থাকতেন তাহলে বারবার এই জাতীয় রচনার মূঢ় পরিবর্তন তাঁদের করতে হতনা। এবং সচেতন পাঠকেরাও এই দুর্মর লজ্জার হাত থেকে বাঁচতেন।

এই রাজনীতি-সর্বস্বতা সাহিত্যকে তাৎক্ষণিক সূত্রে আটকে রাখের সাহিত্যের যে একটা পস্টারিটির দিক রয়েছে তা অগ্রাহ্য হচ্ছে। নান্দনিক শর্ত তো অবশ্যই। এবং ইতস্তত শরনিক্ষেপ করে, আসলে কোথায় লক্ষ্য বিদ্ধ করতে হবে সেই প্রধান ব্যাপারটাই চাপা পড়ে যাচ্ছে।

প্রগতি লেখকদের বিষয় নির্বাচনের থেকেই এই গলদ চোখে পড়ে। যেমন ইদানীং পুলিশী নির্যাতন দেখানোটা লেখকদের প্রিয় বিষয় হয়ে পড়েছে। এমারজেন্সির পর এই প্রবণতাটা এই রকম যে এমারজেন্সির আগে যেন এ ধরনের নির্যাতনের ব্যাপার ঘটেনি। শোষিত মানুষের যে কোনো বেঁচে থাকার দাবির আন্দোলনে পুলিশের এই চিরাচরিত ভূমিকা। নির্যাতনকারী হিসেবে পুলিশকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার অর্থই আসল লক্ষ্যকে বিদ্ধ না করা। পুলিশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ, যার কাজ হচ্ছে পুঁজিবাদীদের স্বার্থে সামাজিক সম্পদকে মুষ্টিমেয়ের হাতে পুঞ্জীভূত রাখার প্রক্রিয়াকে পাহারা

দেয়া। যতক্ষণ না রাষ্ট্র ব্যবস্থা পালটাচ্ছে ততক্ষণ পুলিশ তার কর্তব্য করে যাবে। শুধু এমারজেনসি পর্বেই নয়, শাসক গোষ্ঠীর ইচ্ছানুযায়ী পুলিশ এই-ভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের লেখকেরা সাহসের সঙ্গে এই অত্যাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করছেন, হয়তো ঘৃণা জাগানোই তাঁদের উদ্দেশ্য। কিন্তু পুলিশ স্বাধীন ইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়না, রাষ্ট্র চিন্তা পরিকল্পনার সঙ্গে সে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,—এই মূল বিষয়টাও মনে রাখতে হবে। মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে সৎ-অসৎ পুলিশের ব্যাখ্যায় সময় ক্ষেপণ করেও লাভ নেই। এখানে ব্যক্তির প্রশ্ন ওঠে না, প্রশ্নটা সিসটেমের। পুলিশ মাত্রই এই সিসটেমের দাস। লেখকেরা পুলিশী নির্যাতনের ওপর গল্প লিখেছেন, সে গল্পের বীভৎসতায় পাঠক দস্তুর মতন আঁতকে উঠবেন, কিন্তু উদ্‌বুদ্ধ হবার কোনো ব্যবস্থা সেখানে নেই। ফলে গল্প mechanical realism-এ পরিণত হচ্ছে, যা মার্কসবাদ পরিপন্থী, critical realism হচ্ছে না, এবং বাস্তবকে idealize করারও কোনো লক্ষ্য থাকছে না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশী আক্রমণকে মোকাবিলা করার সাধু সংকল্পও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে মূর্ত করবার চেষ্টার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। কিছুকাল আগে জনৈক তরুণ লেখকের গল্পে দেখা গিয়েছিল যে জোতদারের স্বার্থ রক্ষায় গ্রামে সশস্ত্র পুলিশ হানা দিয়েছে, গ্রামের লোক কীভাবে মোকাবিলা করলেন? কাতারে কাতারে মানুষ নরনারী শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে শূন্য হাতে প্রাচীরের মতো দৃঢ়বদ্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। প্রতিরোধ-কারী মানুষের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখে সশস্ত্র পুলিশ ফিরে গেল। এই জাতীয় প্রতিরোধের গল্প বাস্তবে কাউকে উৎসাহিত করে কিনা এ-প্রশ্ন থেকেই যায়। অর্থাৎ এ ধরনের প্রতিরোধের চিত্র লেখকের রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে পারে নি।

দ্বিতীয় প্রিয় বিষয় হল বেকার, সমাজবিরোধী যুবকদের চিত্র। এরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাম পায়। এরা গ্যাংস্টার বাহিনী—শাসক দলের, পুলিশের সাহায্যকারী ইত্যাদি।

কিন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিংবা নিরক্ষরই ধরা যাক, এই বিশাল যুবসমাজ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার নিয়মেই কর্মহীন বেকার; এবং যতদিন এই সামাজিক কাঠামো থাকবে ততদিন এদের সংখ্যা বাড়বে। বেকারীর জ্বালা ঘোচাতে তাদের তথাকথিত সমাজবিরোধী বনতে হবে। এবং শাসক

পার্টি তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করবে। গ্যাংস্টার বাহিনীও সৃষ্টি হবে।

মুশকিল হয় আসল সমস্যার গভীরে না গিয়ে যখন তরলভাবে তাদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে, ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করে গোঁজামিল দেবার চেষ্টা করা হয়। নিজস্ব রাজনৈতিক আদর্শ দিয়ে আমরা রাজনৈতিক ভাবেই বিরোধী বা ভিন্ন মতাবলম্বীদের মোকাবিলা করতে পারি। এবং সেটাই করা যুক্তিযুক্ত হবে। রাজনৈতিক কর্মী যেমন তার ক্ষেত্রে করবেন, সাহিত্যকর্মীরও নিজস্ব ক্ষেত্রে করার কোনো বাধা নেই। রাজনৈতিক কর্মী তিনি যে নামেই চিহ্নিত হোন তাঁদের মোকাবিলা রাজনৈতিক ভাবেই হবে। তার পথও রয়েছে। এর বাইরে যাঁরা নানা কারণে শাসক পার্টির গ্যাংস্টার বাহিনীতে পরিণত হতে চলেছেন তাঁদেরও বিচারের নিজস্ব একটা মানদণ্ড রয়েছে। এর বিচার সমাজতাত্ত্বিক। যেহেতু সমাজবিরোধী হয়ে কেউ জন্মায় না। সমাজ ব্যবস্থাই তাদের এই পর্যায়ে টেনে নামায়। সমাজ যদি তাদের ন্যূনতম জীবন ধারণের জন্যে কাজ দিতে পারত তাহলে এই বেদনাদায়ক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারত না। গর্কির মতো লেখকও lumpen proletariat-এর কথা ভেবেছিলেন এবং বিপ্লবে তাদেরও কাজে লাগাতে পারা যায় এই রকম বিশ্বাসও পোষণ করেছিলেন। আমাদের লেখকদের কাছ থেকে এই প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি কেন আশা করব না।

এই সমাজ ব্যবস্থা পচে গলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে জেনেও আমরা যারা বিভিন্ন বৃত্তি ও পেশার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছি তারাও তো মাইনে নিচ্ছি শুধু প্রচলিত ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়ে রাখবার জন্যেই। সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী হয়েও আমাদের কাজই হচ্ছে স্থিত স্বার্থকে বজায় রাখা।

মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী সাহিত্যকর্মী হিসেবে সহকর্মী বন্ধুদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নগুলো রাখছি। প্রগতির সঠিক প্রবাহকে সঠিক পথে চালিত ও বেগবান করতে এ ধরনের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে।

লেখা প্রকাশের আগে হওয়া দরকার নিপুণ শিল্পী

কোনো রকমে লেখা ছাপানোর সুযোগ খোঁজার চাইতে সর্বপ্রথম লেখক হয়ে ওঠা প্রধান দরকারী। তরুণ লেখকদের মনে রাখার প্রয়োজন পত্রিকা-গুলো হাত পাকানোর আসর নয়। যখনি কাগজে ছাপতে দিচ্ছি তখন সেটা finished product হয়েছে কিনা লক্ষ্যটা থাকা দরকার। কাগজে ছাপামাত্রই যেমন সেটা লেখা হয়ে ওঠে না তেমনি অসংখ্য লেখা পত্রস্থ করলেই সত্যিকার লেখক হওয়া যায় না। আজকাল তরুণদের মধ্যে কোনোক্রমে একটি লেখা ছাপানোর ব্যাপারে যে ব্যস্ততা দেখি তাতে মনে হয় লেখার পিছনে যে দীর্ঘ অনুশীলনের বিষয়টি রয়েছে সেটাই তাঁরা মনে রাখেন না।

তর্কের খাতিরে কেউ বলতে চাইবেন কাঁচা লেখারও একটা স্বাদ আছে। কিন্তু তাঁরা জানেন না এর ফলে অসংখ্য লেখা ছাপার ব্যবস্থা করেও অনেকেই কাঁচা লেখকই থেকে যান। সাহিত্যের সংসারে কেউ তাঁদের লেখক পদবাচ্য মনে করেন না। সাহিত্যের বিচারে কাঁচা-পাকার কোনো স্থান নেই, প্রকাশিত লেখা মাত্রই যথার্থ সাহিত্য গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন।

সব লেখকই একদা তরুণ থাকেন, কিন্তু যখন তাঁর প্রথম লেখাটি প্রকাশিত হয় তখনি তিনি পাঠক হৃদয়কে জয় করে নেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় 'অতসী মামী' কিংবা সুবোধ ঘোষের 'ফসিল'-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আজকের তরুণ লেখকদের কোনো প্রথম প্রকাশিত লেখাই সাড়া জাগাতে পারে না যেহেতু তাঁদের ধারণা তাঁরা মকসো করতে করতে একদিন লেখক বনে যাবেন! আমার দৃঢ় অভিজ্ঞতায় বলবার স্পর্ধা রাখি এই ধারণা ভুল। মকসোর ব্যাপারটা লেখককে পাঠক চক্ষুর আড়ালেই করতে হবে। তারপর সেই অধ্যায়টা চুকলে যখন তাঁর আত্মবিশ্বাস আসবে তখনি তিনি লেখা প্রকাশ করতে দেবেন। মানিক বা সুবোধ ঘোষ রাতারাতি লেখক বনে যাননি, তাঁদের অনুশীলন পর্বটি লোকচক্ষুর আড়ালেই ছিল।

লেখা ছাপবার এই তড়িঘড়ি লোভটা যদি তরুণেরা কাটিয়ে উঠতে পারেন তাহলে তাঁদেরও মঙ্গল। দৈনিক, মাসিক, সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রয়োজনে অজস্র রচনা যেমন প্রকাশিত হয় তেমন চিন্তা করে দেখলে এর অধিকাংশই

অপাঠ্য, কাগজের পেট ভরানো ছাড়া এদের আর দ্বিতীয় অভীষ্ট নেই। সাহিত্যের ফসল হিসাবে এদের কেউ গোলায় ভরে রাখেন না। হয়তো লেখকেরা কিছু পয়সা পান, এর বেশি কোনো উপযোগিতা নেই।

এই বিষয়টাকে তরুণেরা মনে রাখেন না বলেই আমাদের পরবর্তী অনুজদের মধ্যে দু একটি উল্লেখযোগ্য লেখকও গড়ে উঠল না। তাই সাহিত্যের ব্যাপারটা অনুর্বর হয়ে পড়ছে। এবং পাঠকেরা সাহিত্যের প্রসঙ্গে উৎসাহ পান না।

বিষয়টি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবার আগেই লেখকদের তৎপর হতে অনুরোধ করি। লেখক হওয়ার কোনো ইস্কুল নেই। দাদাগিরি করেও লেখক তৈরি করা যায়না। সকলকে লেখক হবার জন্য কেউ মাথার দিব্যি দেয়নি। কারণ লেখক হওয়া ছাড়াও সমাজে আরো গুরুতর কাজ আছে। লেখক হবার প্রাথমিক শর্তই হচ্ছে তাঁর মধ্যে সৃজনশীল ক্ষমতা আছে কিনা। এই ক্ষমতাটি যাচাই করার আগেই কেউ কেউ লেখক হতে আসেন, এবং পত্রিকার প্রয়োজনে দুএকটি লেখা ছাপাও হয়। তারপর শীতের গাছের পাতার মতোই তাঁরা একদিন নিঃশেষে ঝরে পড়েন। অক্ষমতা সত্ত্বেও লেখক হওয়াটাকেই যাঁরা একমাত্র শস্তা আত্মপ্রকাশের মাধ্যম মনে করেন তাঁরা তা করেন এবং যথাকালে ঝরেও পড়েন। এঁদের নিয়ে আমাদের শিরঃপীড়া নেই। আমাদের উদ্বেগ সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারীদের জন্যে। যেহেতু লেখক হবার স্বাভাবিক শর্তই তাঁদের রয়েছে। কিন্তু উর্বর জমিতে বীজ ছিটিয়ে দিলেই যেমন ফসল ফলে না, জমি চাষ করতে হয়, তেমনি সৃজনশীল ক্ষমতারও অনুশীলন দরকার। রাতারাতি সরস্বতীর বরপুত্র হওয়ার থিয়োরিটি একেবারে বাজে। সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী মানুষটি তাঁর আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসেবে যখন একমাত্র লেখাকেই বেছে নেন তখন প্রমাণ হয় লেখা ছাড়া তাঁর আর দ্বিতীয় মাধ্যম ছিল না। তিনি গায়ক হলেন না, চিত্রকর হলেন না, তিনি লেখকই হলেন।

সৃষ্টিশীল গুণের সঙ্গে লেখক তাঁর অভিজ্ঞতার জগতটিকেও সমৃদ্ধ করে তুললেন। কিন্তু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় এবং হুবহু সেই অভিজ্ঞতাকে প্রকাশ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অভিজ্ঞতার চোখ চাই অর্থাৎ তাঁর মনের মধ্যেই ঝাড়াই-বাছাইয়ের কাজ চলতে থাকে। ঝাড়াই-বাছাই করে যা তিনি বাইরে প্রকাশ করেন সেটা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিশিষ্ট মানসিকতা, তথা লেখক ব্যক্তিত্বের পরিচয়বাহী।

তাই স্বীকার করতে হয় অভিজ্ঞতাই লেখককে গড়ে তোলেনা তার জন্যে চাই পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং দৃষ্টিভঙ্গি। লেখকের ব্যক্তিগত Mental make-up তো অবশ্যই। সংসারে লেখা এবং লেখকের এত যে বৈচিত্র্য তার কারণও এই। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র তারাশঙ্কর মানিক সাহিত্য সেই কারণেই বৈচিত্র্যপূর্ণ। তেমনি বিচিত্র টলস্টয় তুর্গেনিভ দস্তয়ভস্কি শেকভ গর্কির রচনা।

সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারেই লেখকের পক্ষে স্রষ্টার অহংকার স্বাভাবিক। জননীর কাছে যেমন মাতৃত্ববোধ। স্রষ্টার এই অহংকার লেখককে আত্ম-মর্যাদাবোধসম্পন্ন করে তোলে। যে গৌরববোধ তিনি কোনো কারণেই বিকিয়ে দিতে পারেন না। তাহলে তিনি কোনো কালেই মহৎ লেখক হতে পারেন না।

লেখক তরুণই হোন অথবা প্রবীণই হোন এই আত্মপ্রত্যয় তাঁর দরকার যে আমি যেভাবে, দেখেছি অন্য কেউ সেভাবে দেখেনি, আমি যেভাবে প্রকাশ করেছি অন্য কেউ সেভাবে প্রকাশ করেনি। তার মানে এই নয় যে আমি সাহিত্যের তথাকথিত ঐতিহ্য অস্বীকার করছি। স্বীকরণের নিয়মে রবীন্দ্র শরৎ প্রমুখ আমার মধ্যে লীন হয়ে গিয়েও আমি তাঁদের অনুসরণ করছি না, আমার যুগের প্রয়োজনে সাহিত্যকে অগ্রসর করিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এবং আমার পর্যবেক্ষণ ও প্রকাশভঙ্গি আমার নিজস্ব—রাবীন্দ্রিক বা শরৎচন্দ্রীয় নয়। এবং ঘোষণা করতে পারছি আমি আজকের দিনে যা লিখছি তা সেদিনের রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না। যেমন আজকের দিনে সম্ভব নয় আমার পক্ষে রবীন্দ্র শরৎচন্দ্র হওয়া।

এবার আমাদের প্রসঙ্গে আসা যেতে পারে।

সৃজনক্ষম মানুষের পক্ষে লেখক হতে গেলে যেমন দরকার অভিজ্ঞতা তেমনি দরকার মানসিক গঠন, পর্যবেক্ষণশক্তি এবং প্রকাশভঙ্গি।

কিন্তু এতগুলি গুণ থাকা সত্ত্বেও মহৎ লেখক হওয়া যাবে না যদি লেখায় না থাকে দার্শনিকতা। Philosophy of Life ছাড়া প্রধান লেখক হওয়া যায় না। টলস্টয়-রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর-মানিক প্রত্যেকের লেখাতেই বিশিষ্ট দার্শনিকতার প্রকাশ রয়েছে। তা এই দার্শনিকতা সনাতনী ভাববাদীই হোক কিংবা বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকই হোক। সামাজিক অবস্থান, জীবন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কারণেই কেউ ভাববাদী হন কেউ বস্তুবাদী। টলস্টয় টলস্টয় হয়েছেন, গর্কি গর্কি।

আমাদের দেশে বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা থাকলেও ভাববাদী দর্শনের ব্যাপক

প্রচারে এ দেশের বেশির ভাগ মানুষ ভাববাদী ধ্যান ধারণায় পুষ্ট। তাই বিচিত্র অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও লেখকেরাও ভাববাদের প্রভাবকে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু ভাববাদী দর্শনই ভারতবর্ষের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এই ধারণাটাও কায়েমী স্বার্থবাদীদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় বিচার করার নামই মার্কসবাদ। এই মার্কসীয় দর্শন আমাদের তথ্যকথিত সনাতনী ভাবধারাকে আঘাত করে। সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজকে পুনর্মূল্যায়ন করার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। যার দ্বারা উপরিতল সহ বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার গোটা স্ট্রাকচারটাই ভেঙে পড়ে। এবং সমাজে প্রতিনিয়ত শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারটাকে অস্বীকার করা যায় না। একদা শ্রেণী সংগ্রামের কারণেই ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে বুর্জোয়া সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল ঐতিহাসিক প্রয়োজনে। আজকে তেমনি বুর্জোয়া সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা লুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণেই গড়ে ওঠার দরকার সমাজ তান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা গড়ায় যে শ্রমিকশ্রেণী একদা বুর্জোয়াদের অবলম্বন ছিলেন এখন তাঁরাই তাদের বিচারক এবং ধ্বংসকারী।

আজকের দিনে সচেতন লেখকের কাছে এই সত্যটি ধরা পড়া উচিত। এবং যথার্থ লেখক হতে গেলে সর্বহারা শ্রেণীর দর্শনটি আয়ত্ত করা প্রয়োজন। কারণ শ্রমিক শ্রেণীই সমাজ পরিবর্তনকামী শক্তি, তাঁরাই পুরনো পৃথিবীকে পালটে দিতে পারেন। লেখককেও সজ্ঞানে এই পরিবর্তনকামী অংশের সঙ্গে তাঁর লেখাকে যুক্ত করতে হবে।

নতুন সাহিত্য এবং প্রাসঙ্গিকতা

প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য শিবির তো বটেই, এমনকি প্রগতিশীল সাহিত্যসভা থেকেও প্রায়শই বক্তারা বলবার চেষ্টা করেন যে, বুর্জোয়া লেখকেরা অনেক বেশি শক্তিশালী। আমার বিশ্বাস এধরনের অভিমত সমালোচকরা বিশেষ চিন্তা ভাবনা না করেই উদ্‌গার করেন। বিষয়টার গভীরে প্রবেশ করলে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন যে বুর্জোয়া লেখকেরা দীর্ঘ দিনের বুর্জোয়া সাহিত্য-ঐতিহ্যে পুষ্ট, অন্যদিকে প্রগতিশীল লেখকেরা বুর্জোয়া দর্শনমুক্ত যে নতুন দর্শনের কথা প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন তা বিষয় ও প্রকাশে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রগতিশীল সাহিত্য বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহ্যকে নিজস্ব দর্শনে বিচার ও বিশ্লেষণ করে ঐতিহ্যকে ভেঙে "নতুন সাহিত্য" সৃষ্টি করতে চাইছে। বক্তব্য এবং প্রকাশের দিক দিয়েও তাঁরা নতুন পথ খুঁজতে অভিলাষী। ফলত, বুর্জোয়া সাহিত্যের প্রচলিত সংস্কার নিয়ে বিচার করতে গেলে এই "নতুন সাহিত্যকে" আমরা বুঝতে ব্যর্থ হব। সচেতন পাঠক দেখতে পাবেন বুর্জোয়া সাহিত্যের সঙ্গে এর তেমন যোগসূত্র পাওয়া যায় না। তার প্রথম কারণ প্রগতিশীল লেখক তাঁর রচনাকে দায়িত্বশীল সামাজিক কর্ম বলে মনে করেন, এবং নিশ্চিতই "উদ্দেশ্যমূলক", শিল্পের জন্য শিল্পে তিনি বিশ্বাসী নন। এই দায়িত্ব বোধের সঙ্গেই তিনি সমাজ পরিবর্তনের মানসে খোঁজেন সমাজের সেই প্রগতিশীল অংশকে যার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য অন্বিত। বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থা আজ আর বৃহত্তর মানুষকে কিছু দিতে পারে না, কাজেই তাকে আঁকড়ে রেখেই যখন বুর্জোয়া লেখকেরা প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে রঙচঙ মাখিয়ে দাঁড় করাতে চান তখন প্রগতিশীল লেখকেরা পুরোপুরি কাঠামোটাকেই ভেঙে ফেলতে চান। দীর্ঘদিন ধরে একটা তৈরি করা জিনিস এবং অন্যদিকে তাকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা—এই কঠিন সাধনাকে সবসময় সকলে বুঝে উঠতে পারেন না। এবং ভাঙার কালে তেমন ছন্দ থাকছে না শ্রী থাকছে না ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন। প্রগতিশীল লেখকেরা আজকে এই ভাঙনের কারিগর এবং এই ভাঙনটাই এখন সবচেয়ে জরুরি, তাই গড়নের শিল্প-নৈপুণ্যে যদি তেমন নজর

না পড়ে থাকে তাহলে তাঁদের এখনি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো ঠিক হবে না। ভাঙনের পূর্বে এমনটিই হওয়া স্বাভাবিক। একটু মনোযোগ সহকারে পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে প্রগতিশীল লেখকদের বিষয় চয়ন সম্পূর্ণ নতুন, যা বুর্জোয়া লেখকদের কাছে পরিত্যক্ত। শ্রমিক আন্দোলন, চাষী আন্দোলন, মধ্যবিত্তের "শ্রেণীচ্যুত" হওয়ার পবিত্র সংকল্প, প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিরোধ, সমূহ বিষয়ই বুর্জোয়া লেখকদের কাছে অরুচিকর। তাঁরা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার পতনের কালেও যৌনতা, রাজনৈতিক কিস্সা, মাদক বড়ি, বেল্ বটস্ নিয়ে "ব্যক্তিবাদী" সাহিত্য মকসো করে যাচ্ছেন। যার চরিত্রলক্ষণ ক্ষয়িষ্ণু। এঁরা সমাজ ব্যবস্থার শ্মশানযাত্রী। অস্তিমযৌবনে খদ্দের টানবার জন্যে কিম্ভূত রঙচঙ মেখে এঁরা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

প্রগতিশীল লেখকেরা জানেন এই বৃদ্ধ জরদ্গব সমাজ ব্যবস্থার মৃত্যুবাণ রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে। একদা ধনতন্ত্র এই শ্রেণীকে ভূতের বেগার খাটাতে কাজে লাগিয়েছিল, এখন এই ভূতেরাই সচেতন মানুষ হয়ে সমাজ কাঠামোটাকে উল্টে ফেলতে উদ্যত। প্রগতিশীল লেখক সমাজ পরিবর্তনের নিয়মটা জানেন। জানেন বলেই তাঁদের সাহিত্য চিন্তা প্রগতিকামী অংশের নান্দী গাইতে প্রস্তুত। যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এখনো তৈরি হয়নি তারই আবাহন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে প্রগতিশীল লেখকদের কলমে। সমস্ত অবস্থাটা ভ্রূণের মতো, ভ্রূণকে দেখে পুরোপুরি মানুষের আদলটার বিচার করা সুবিবেচনার কাজ হবে না। এটা একটা তৈরি হয়ে ওঠার অবস্থা, তার বিচারের জন্যে কিছু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে যতক্ষণ বুর্জোয়া ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ছিল ততক্ষণ বুর্জোয়ারা তাঁকে শিরোপা দিয়েছেন। উত্তরকালে তিনি যখন সচেতনভাবে শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকে গ্রহণ করলেন তখন প্রতিক্রিয়াশীলরা লেখকের প্রতিভার অপহ্নুতি আবিষ্কার করে মর্মাহত হলেন। শেষ পর্বে মানিকবাবু বুর্জোয়া সাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে সরে গিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন তা সম্পূর্ণ "নতুন সাহিত্য", শুধু বিষয়ে নয়, প্রকাশভঙ্গিতেও। "কি লিখব" এবং "কেমন করে লিখব" দুয়েরি সমন্বয় ঘটেছে। "পুতুল নাচের ইতিকথা"-পড়া বুর্জোয়া পাঠক অবশ্যই তাঁর "চিহ্ন" কী "সোনার চেয়ে দামী" পড়ে উৎফুল্ল হবেন না। বুর্জোয়া সমালোচকদের মতো প্রগতিশীল মহলেও সমালোচকদের মনে লেখকের 'উত্তরপর্ব' সম্পর্কে দ্বিধা আছে। আমার বিশ্বাস

সে দ্বিধার সমস্যা তথাকথিত সমালোচকেরই নিজস্ব, লেখক মানিকের নয়। কারণ "নতুন সাহিত্যের" ব্যাপারটা সম্পর্কে অজ্ঞ পণ্ডিতেরা এক্ষেত্রে বুর্জোয়া সংস্কারেরই দাসত্ব করছেন। "নতুন সাহিত্য" এখনো পর্যন্ত সূচনার স্তরে, নির্মীয়মান পর্যায়ে, পুরোপুরি ঐতিহ্যে পরিণত না হলে তার চারিত্র্য বিচারে তড়িঘড়ি রায় দেয়া মূর্খতা।

সন্দিগ্ধমনা পুনরায় প্রশ্ন তুলতে পারেন প্রগতি সাহিত্যের কী কোনো দুর্বলতা নেই? নিশ্চয়ই আছে, তার পর্যালোচনা আত্মসমালোচনার নিরিখেই হবে। তার জন্য বুর্জোয়া সাহিত্যের সঙ্গে কোনো তুলনা করাই চলতে পারে না।

প্রগতি সাহিত্যের প্রধান দুর্বলতা লেখকেরা মার্কসীয় দর্শনকে নিরাসক্ত বিজ্ঞানীর মতো আয়ত্ত করতে পারেন নি। প্রগতিশীল লেখক তাঁর বিশ্বাস মতো একেকটি রাজনৈতিক পার্টির কর্মী অথবা সমর্থক। অবশ্য তাতে লেখক হতে কোনো বাধা নেই। বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখনি যেমন দেখা যায় প্রকৃত মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিকে উপেক্ষা করে তাঁরা নিজস্ব পার্টির বিভিন্ন সময়ের লাইনকে আশ্রয় করে সাহিত্যে নিযুক্ত হন। মার্কসীয় দর্শনকে আয়ত্ত করা আর পার্টি লাইনকে অনুসরণ করা এক জিনিস নয়। কোনো সৃজনক্ষম লেখকই এই পথ ধরে মহান লেখক হতে পারেন না। ম্যাকসিম গর্কি দস্তুর মতো রাজনৈতিক কার্যক্রম এবং পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকলেও তাঁর লেখায় এ জাতীয় যান্ত্রিক সীমাবদ্ধতা নেই। তিনি সর্বহারার মানবতাকেই তাঁর সাহিত্যে আশ্রয় করেছেন। আমাদের দেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শেষ পর্বের রচনাবলীতে তারই স্বাক্ষর। এমন কি তেভাগা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কাহিনী লিখেও, পরবর্তীকালে রাজনীতি হিসাবে এ-আন্দোলনের অস্ত্যর্থক-নঞর্থক সমালোচনা হলেও, সেগুলি সার্থক হয়ে বেঁচে রয়েছে। তার কারণ মানিকবাবু পার্টি লাইন ধরে গল্প লেখবার চেষ্টা করেননি, দরিদ্র কৃষকের ফসল ও অধিকার রক্ষার চিরন্তন সংগ্রামকেই তিনি রূপ দিয়েছেন, যার আবেদন আজো পর্যন্ত ফুরোয়নি। সাম্প্রতিক লেখকেরা পার্টি লাইনকে যথাযথ গল্পে হাজির করবার অত্যুৎসাহে ব্যাপক শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনকেই বুঝতে পারছেন না। ফলে তাঁদের সাহিত্য বিশেষ পার্টি কর্মী ও সমর্থকদের চাহিদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। বৃহত্তর শ্রমজীবী মানুষের হৃদয়ে তা প্রবেশ করতে পারল না। প্রগতি সাহিত্য তাই নিছক রাজনৈতিক কর্মী ও সমর্থকদের ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে রইল।

স্পষ্ট করে ব্যাপারটা বোঝা দরকার। এদেশে মার্কসবাদকে আশ্রয় করে ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন পার্টির অস্তিত্ব বাস্তব ঘটনা। এই ঘটনাকে ভিত্তি করেই বর্তমানে পশ্চিম বাঙলায় বামফ্রন্ট সরকার গড়ে উঠেছে। এই বামফ্রন্টের শরিক দলগুলির নিজস্ব লেখক আছে। এবং এঁদেরই সাহিত্যের মুখপত্রে এঁরাই বিরাজ করেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয়, কখনোই দেখি না এক পার্টির পত্রিকায় অন্য পার্টির লেখকদের রচনা। রাজনৈতিক ফ্রণ্টে যখন তাঁরা ঐক্যের অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে কেন তা গড়ে ওঠে না, সেটা বুঝে ওঠা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ পার্টিগুলি শ্রমিকশ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী। অথচ সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে বারবার প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে আমরা 'ব্রড-বেসড ডেমোক্রাসি'র কথা বলছি! উল্টো করে বললে স্বীকার করতে হয় অনাবশ্যক পার্টিগত গোঁড়ামি ব্যাপক মার্কসবাদী সাহিত্যান্দোলনকেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই সংকীর্ণ মানসিকতা প্রগতি সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সমাজকেই সঠিক লক্ষ্যের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে না। এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের একতা সুপরিকল্পিতভাবে মার্কসবাদী সাহিত্যধারাকেই আক্রমণ করতে চলেছে।

সমস্যাটা প্রতিকারের বাইরে চলে যাবার আগেই এ ব্যাপারে যদি আমরা এখুনি সচেতন হই তাহলে প্রগতি সাহিত্যই লাভবান হবে। এই প্রগতিবাদী লেখকদের সচেতন মোর্চা প্রতিক্রিয়ার ঘাঁতাতের দুর্গে কামান দাগতে পারবে। যেহেতু এই দুর্বলতার সুযোগটাই বিরুদ্ধমহল প্রতিনিয়ত নিচ্ছে এবং ব্যাপক প্রচারযন্ত্রের দৌলতে প্রগতি সাহিত্য ধারাকে ক্রমাগত নস্যাৎ করবার চেষ্টা করছে। এবং সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের তরফের কিছু কিছু সমালোচক বিষয়ের গভীরে না গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের সঙ্গে অর্থহীন তুলনায় আমাদের নতুন প্রয়াসকে ছোটো করে দেখছেন।

বুর্জোয়া লেখকদের স্ট্যাণ্ডার্ড না ধরে হীনমন্যতার দায় থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে পারি তা হলে দেখব এই নির্মীয়মাণ পর্বেও প্রচুর বিরোধিতা সত্ত্বেও আমাদের লেখকেরা যা করছেন তা অভিনন্দনযোগ্য। আগামী দিনে শ্রমিক-শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সাহিত্যও পা মিলিয়ে চলেছে। এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপকে বুর্জোয়া সংস্কারের চোখে দেখলে বারবার ভুল হবে। এ কথা ঘোষণা করবার সময় এসেছে যে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যেমন আগামীকাল ভবিষ্যত নির্দিষ্ট, তেমনি এই 'নতুন সাহিত্য-ই' প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকে

একদিন জঞ্জালের মত দূর করে দেবে। কারণ নতুন পৃথিবীতে পুরনো সাহিত্য চিন্তার স্থান নেই। এই দায়িত্ববোধই আমাদের লেখককে তাঁদের শিল্পকর্ম সম্পর্কে সচেতন করবে। যেহেতু তাঁরা জানেন একটা মহৎ কাজের যোগ্য হতে গেলে তাঁদের সৃষ্টিকেও সর্বরকমে মহৎ করে তোলা দরকার। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের প্রয়াসকে সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে হবে এবং তারি জন্যে সমালোচককেও সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে।

সাহিত্যে সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি

সেদিন কয়েকজন তরুণ লেখক আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনি বারবার সাহিত্যে সর্বহারা শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটি আয়ত্ত করতে বলেন। বিষয়টা একটু সহজ করে বোঝাবেন, এবং সাহিত্যে কিভাবে তাকে প্রয়োগ করা যায়, তাও একটু বলুন।

বললাম: চোখের সামনে যে সমাজ কাঠামোটা আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি সেটা ধনিক শ্রেণীর সমাজ। স্ট্রাকচার, সুপারস্ট্রাকচার —সবই তাদের স্বার্থ-রক্ষার দিকে চেয়ে মজবুত করে তৈরি। ফলে সামাজিক সমূহ দৃষ্টিভঙ্গি বড়লোকদের দৃষ্টি থেকে গড়া। এটা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেয়া হয়েছে যে, সমাজে ধনী ও গরিব চিরকালই বজায় থাকবে এবং বড়লোকদের শুভেচ্ছার পরেই গরিবদের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। তাই কতকগুলো মানবিক গুণকে বড় করে দেখানো হয়। যেমন দয়া, সহানুভূতি, সেবা এবং নতুন নতুন শব্দ চয়ন করা হয়, যেমন 'দরিদ্রনারায়ণ', 'হরিজন' ইত্যাদি। এই গুণ বা শব্দাবলীর যে বাস্তব তাৎপর্য নেই তা নয়। সমাজে দয়ালু জমিদার বা ধনকুবেরের বদান্যতার কাহিনী মিথ্যে নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা যদি অন্যভাবে ভাবা যায়, ধরা যাক, সমাজে দরিদ্র নেই, সকলেই পরিশ্রমের বিনিময়ে প্রয়োজন মতো খাদ্য পাচ্ছেন তাহলে সমাজে 'অভাব' বলে পরিচিত বিষয়টাও থাকছে না। সেক্ষেত্রে দয়া, সহানুভূতি, সেবা ইত্যাকার গুণাবলী বাস্তবে প্রয়োগ করার সুযোগ না থাকার কারণে সেগুলি বাজে কথায় পরিণত হয় না কি!

এতদিন আমাদের সাহিত্যিকেরা কমবেশি এই ধনিকশ্রেণীর ধ্যান-ধারণার দ্বারা পুষ্ট হওয়ার জন্যেই কখনো অজ্ঞানে প্রভুর দর্শনকেই রচনায় অনুসরণ করে চলেছেন। তাঁরা প্রজাভক্ত প্রেমিক জমিদারের চিত্র আঁকেন, মিল মালিকের আশ্চর্য বদান্যতার কাহিনী বর্ণনা করেন। সুদখোর মহাজনের অপূর্ব আত্ম-ত্যাগের কীর্তন করেন, ধনীনন্দনের উদারতা কী করে কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করলো তার বর্ণাঢ্য ঘোষণা করেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব ঘটনা যে সমাজে কখনো সখনো ঘটে না এমন নয়। খবরের কাগজে এ-জাতীয়

আদর্শ খবর পড়ে নিখাদ গরিবের চোখেও জল আসে। যেহেতু গরিবেরাও অজ্ঞাতসারে বুর্জোয়া ফিউডাল ধ্যান ধারণার দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে প্রভাবিত। ভিক্ষাজীবীও এদেশে মহৎ বলে কীর্তিত। দেবাদিদেব ভোলানাথও স্বয়ং ভিখারি কিনা!

এই ধরনের ধ্যানধারণা যতদিন প্রচলিত থাকে ততদিন সামাজিক স্থিতির ব্যাপারটাকে সনাতন, শাশ্বত বলে চালিয়ে দেয়া যায়।

আর, লেখকও এই সকল বক্তব্য প্রচার করে ধনীশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

সাহিত্যে এই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিছক বুর্জোয়া। সর্বহারা শ্রেণীর যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা আমরা এখন বলতে চাইছি তা হলো সম্পূর্ণ উলটো। সোজা কথায় সংখ্যাগুরু গরিবদের দৃষ্টিতে সমাজ, রাষ্ট্রকে দেখা। সে-দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত সচেতন। এ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বাগ্রে জানিয়ে দেয় যে, সমাজে ধনী-গরিব শাশ্বত ব্যাপার নয়। পুঁজিবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে সামাজিক সম্পদ কুক্ষিগত থাকে, যে সম্পদ অসংখ্য মানুষের শ্রমশক্তিকে নামমাত্র মূল্যে খাটিয়ে পাহাড়প্রমাণ শোষণের ওপর গড়ে ওঠে। সামাজিক সম্পদের ওপর অধিকাংশ মানুষের অধিকার থাকলে সমাজে দরিদ্র থাকত না, এবং কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দয়া, সহানুভূতি, ভিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলোও ফলাও করে প্রচার করবার সুবিধে হত না! এই নতুন বোধ স্পষ্টাস্পষ্টি গরিবকে শ্রেণী হিসেবে সচেতন করত এবং সে তার শোষণকারী ধনিকশ্রেণীর সঙ্গে তার অবশ্যম্ভাবী বিরোধকেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারত এবং তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেখত ধনীশ্রেণী তার এতদিনকার দখলকে এক চুলও ছাড়তে রাজি নয়। পরিণতি শ্রেণী সংগ্রাম। শ্রমিকশ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনী, তার পার্টি, দীর্ঘস্থায়ী সর্বাত্মক সংগ্রাম, বিপ্লব, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ইত্যাদি।

এই রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছবার মধ্যবর্তী সময়ে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী লেখক তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করে দিতে পারেন। তাঁকে সর্বহারা, আরো সহজ করে বলি শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটি আয়ত্ত করতে হবে। অর্থাৎ বড়লোকের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, সমাজকে দেখা নয়, গরিবদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র, সমাজ এবং বড়লোককে দেখা। লেখকের কাজ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে সজাগ রেখে বড়লোক ও তার ধ্যানধারণা, শ্রেণী সমন্বয়ের দর্শনকে প্রতি মুহূর্তে আক্রমণ করা, ব্যঙ্গ করা, উলঙ্গ করে তার নখদাঁত, হিংস্র মুখটাকে উন্মোচন করে দেয়া।

লেখক শুধু যে চাষী মজুরের কথাই বলবেন এমন ধরাবাঁধা ছাঁচের দরকার নেই · বুর্জোয়া, মিল মালিক, জমিদার-জোতদার-মহাজন—এই শ্রেণীগুলি যে কাগজের বাঘ, সংঘবদ্ধ শ্রমিক-জাগৃতির জোয়ারে তৃণের মতো ভেসে যাবে, যার বাস্তব প্রমাণ দেখা গেছে রাশিয়ায়, চীনে, এই চেতনা জাগানো প্রয়োজন, আন্তর্জাতিক শ্রমিক-বিজয়ের পতাকাটা উর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে।

আশা করি ব্যাপারটা সহজ করে বোঝাতে পেয়েছি।

কিছু উদাহরণ দেবার চেষ্টা করি।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'দুইবিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' কিংবা 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' রচনা করেন, বিষয় নীচু তলার মানুষ হলেও এদের যে দৃষ্টিভঙ্গিতে আঁকা হয়েছে তা নিছক সামন্ততান্ত্রিক। ভূস্বামীর সামাজিক অবস্থানের কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটি আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নি। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র 'মহেশ' গল্প রচনা করে গফুরের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটিকে প্রয়োগ করেছেন। জমিদারের চোখ দিয়ে ভাগচাষীকে দেখা নয়, ভাগচাষীর চোখ দিয়ে তামাম গ্রামীণ সামন্ত সমাজকে সমালোচনা করা হয়েছে। এমনকি শরৎচন্দ্র উৎখাত চাষীকে চটকলের মজুরে পরিণত করে কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বর্ধন করেছেন।

আমাদের একালের লেখকদের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গিটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচুর ছোটগল্পে ব্যবহৃত। বিশেষ করে তে-ভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে। শুধু যে আন্দোলনের কথাই মুখস্তের মতো বলে গেছেন লেখক তা নয়, বড়লোকদের বিপরীতে দরিদ্র খেটে-খাওয়া মানুষের সামগ্রিক চরিত্র তুলে ধরে তাঁদের বড়লোকদের চেয়ে মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ করে এঁকেছেন। তাদের সততা, মেজাজ, বিপদে কৌশল, জোতদার আর তার রক্ষক পুলিশবাহিনীকে ঠকিয়ে নেতাকে উদ্ধার করা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের 'কমন সেন্স'-কে 'আন-কমন' করে প্রদর্শন করেছেন। তাঁরা একেকজন 'হিরো'-তে পরিণত হয়েছেন। যেখানে শ্রেণীসংগ্রাম প্রধান হয়ে ওঠেনি তেমন গল্পেও তথাকথিত ধনীপরিবারের আভিজাত্যের অহংকারকে চূর্ণ করে দিয়েছেন। ধনী পরিবারে নবজাতক সন্তানের মুখেভাত উৎসব হচ্ছে, আর সেই উৎসবে ভৃত্যশ্রেণীর মানুষটি আভি-জাত্যের আংরাখাকে খুলে দিচ্ছেন, যখন জানা গেল সন্তানটি ওই ভৃত্যটিরই ঔরসজাত। এর মধ্যে দিয়ে মানিকবাবু class hatredও প্রচার করেছেন।

হাল আমলে আমার এক চেনা লেখকের একটি গল্প পড়েছি। গ্রামের

এক দম্পতি শহরে এসে উঠেছে যুবতী বউকে কলকাতা শহর দেখাবে বলে। স্বামীটি কিছুকাল শহরে বাস করে বাবুশ্রেণীকে অজ্ঞাতসারে যেন অনুকরণ করতে উদ্যত। তার স্বাস্থ্যবতী স্ত্রী দীর্ঘকাল জননী হতে পারে নি। অক্ষমতা কোন্ পক্ষের যাচাই হয়নি। শহরে কাকার ডেরায় পা দিয়ে দুদিনের মধ্যেই স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য। প্রথম দিন অনেক রাত্রে মদে চুর হয়ে সে ফিরে এল। জোর করে সেদিন স্ত্রীকে উপভোগ করল। দ্বিতীয় দিন স্ত্রী বাধা দিল। পালিয়ে কাকার কাছে আশ্রয় নিল। মাতাল স্বামী তাকে কেড়ে নিতে এলে কাকা মোটা লাঠি নিয়ে তাকে মারতে মারতে গর্জন করে উঠল : 'শালো, ভদ্দরলোক হয়েছে, বাবু হয়েছে, বউকে বেবুশ্যে পেয়েছে···' প্রচণ্ড মার দিয়ে চাষার ছেলের মধ্যে তার মাটি-ঘেঁষা চরিত্রকে নতুন করে উপলব্ধি করানো এবং সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত ভদ্দর লোক বাবুদের দাম্পত্য জীবনের প্রতি নির্মম কটাক্ষ।

হ্যাঁ এ দৃষ্টিভঙ্গিও শ্রমিকশ্রেণীর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি।

লেখার বিষয়

দক্ষিণপন্থীই হোন আর বামপন্থীই হোন সাম্প্রতিক বাঙলা সাহিত্যে বিষয়ের দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। দক্ষিণপন্থীরা যৌনগন্ধী একই তাস বারবার খেলে পাঠকদের ক্লান্ত করে ফেলেছেন। যৌনতার সঙ্গে ক্রাইম যোগ করেও পাঠকদের তেমন টানছে না। এবার লেখকেরা ধর্মসঙ্ঘের আফিম মেশাবার চেষ্টা করছেন, তাও জমবে না। রাজনীতির নামে বজ্জাতি, না তাও না।

এ তো দক্ষিণপন্থীদের সাহিত্যে ডেকাডেন্টের চেহারা। এই গণ্ডী থেকে বেরোবারও কোনো ঝুঁকি এই লেখকেরা নেবেন না। কারণ ধনী মুরুব্বিদের হারাতে হবে। এঁদের লেখার সামাজিক তাৎপর্যের কোনো বালাই নেই। কারণ এঁরা লেখক নন, বৃত্তিভোগী পোষা কর্মচারী মাত্র।

এবার বামপন্থীদের দিকে চোখ ফেরানো যাক। তাঁরা কী করছেন? প্রথমেই সংশয় জাগে এঁদের মধ্যে কজনই বা সৃজনশীল গুণের অধিকারী? দু একজন খুঁজে পাওয়া ভার যাঁরা দু একটিও শিল্পরসোত্তীর্ণ রচনা লিখে যোগ্যতা দেখিয়েছেন। এমন মনে করি না যে এঁদের অভিজ্ঞতা নেই কিংবা লেখার ক্ষমতা নেই। আছে। কিন্তু লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণেই তাঁরা ইতস্তত শর নিক্ষেপ করছেন যা অভীষ্টকে বিদ্ধ করতে পারছেন না।

প্রথমত তাঁরা যে মার্কসীয় দর্শনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করছেন সে-সম্পর্কেই বৈজ্ঞানিক ধারণা নেই। সর্বহারা শ্রেণীর যে দৃষ্টিভঙ্গিটি আয়ত্ত করবার প্রয়োজন তাই আয়ত্ত করতে পারছেন না। তার ফলে বামপন্থী রচনায় প্রয়োজনীয় ব্যাপকতা ঘটছে না। দক্ষিণপন্থীর পাশাপাশি একটি সঠিক আদর্শ গড়ে উঠছে না।

সাম্প্রতিক বামপন্থী লেখকদের অন্যতম প্রিয় বিষয় হচ্ছে সন্ত্রাসের ছবি আঁকা। সন্ত্রাস একটি বাস্তব ঘটনা। কিন্তু এই সন্ত্রাসের ছবি আঁকতে গিয়েও লেখকেরা তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক ধ্যানধারণাকেই অতিসরলীকরণের ভঙ্গিতে লেখায় প্রয়োগ করছেন। শ্বেতসন্ত্রাস লাল সন্ত্রাসের বিশ্লেষণ একাকার হয়ে যাচ্ছে। একই নিশ্বাসে পুলিশ-মিলিটারি সন্ত্রাস এবং সমাজ বিরোধী

লুমপেন ও রাজনৈতিক কর্মী একই কালিতে লিখিত হচ্ছে। এবং শ্রেণীশত্রু বলে যে প্রধান বিষয়টি রয়েছে সেটিই উপেক্ষিত হচ্ছে। এই ব্যাপারে সত্যকার সমাজ পরিবর্তনের ন্যূনতম প্রয়াসের বিরুদ্ধে আসল যে সন্ত্রাসটি বৃহত্তর মানুষকে চোখ রাঙাচ্ছে সেখানে কোনো দৃষ্টিপাত নেই। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে মুখোশধারী যে এজেন্টগুলি রয়েছে তাদেরও চিনিয়ে দেবার সঠিক অনুসন্ধান নেই। ফলে সমূহ সন্ত্রাসের কাহিনী খবর কাগজের ভাসাভাসা রিপোর্টে পরিণত হচ্ছে মাত্র।

আমরা চোখের সামনে পশ্চিম বাঙলায় যে সন্ত্রাসের চিত্র দেখেছি তার মর্মমূলে কোনো বামপন্থী লেখক পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন? না, করেন নি। ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সীমাবদ্ধতা কাটাতে কেউ পারেন নি। ফলে যেখানে একই উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত কর্মীদের মিত্র হওয়ার দরকার ছিল সেখানে বৈরিতামূলক সম্পর্ক অন্তরালবর্তী মূল শত্রুকে নিরাপদ করেছে। দুজন সমাজ পরিবর্তনকামী কর্মী পরস্পরকে সন্দেহ করছেন এ একটা অবিশ্বাস্য ঘটনা। একজন কমিউনিস্ট আর একজন কমিউনিস্টকে নিষ্ঠুর পৈশাচিক ভাবে হত্যা করছেন এ একটা দুরপনেয় কলংক। এই কলংকের কালিমা থেকে আমরা কেউই মুক্ত নই। আগামীকাল আমাদেরই এর জবাবদিহি করতে হবে।

কই, আমাদের লেখকদের রচনায় তো এই ভয়ংকর বেদনা ও দুঃখের চিত্র নেই! নাকি আমরাই উত্তেজিত হয়ে ছিন্নমস্তা রচনা লিখে গেছি।

আমাদের বামপন্থী লেখকদের রাজনীতি সচেতনতা সম্পর্কে আমার কোনো অবিশ্বাস নেই। কিন্তু সে রাজনীতির অর্থ বৈপ্লবিক সচেতনতা ছাড়া আর কিছু নয়। অর্থাৎ এই মহৎ যজ্ঞে কে আমার পক্ষে কে আমার বিপক্ষে।

রাজনীতি সচেতন সাহিত্য কর্মীর মাধ্যমের ভিন্নতার কারণেই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্র নিজস্ব। সেখানে তিনি জনগণের সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে তাঁর প্রেরণা গ্রহণ করেন। সে প্রেরণা তেলেঙ্গানা, কাকদ্বীপ কিংবা নকশালবাড়ি থেকে হলেও বাধা নেই। পরবর্তীকালে তেভাগা আন্দোলনে রাজনীতিগত কী ত্রুটি ঘটেছে এটা সাহিত্যকর্মীর বিবেচ্য হলেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেই পর্বের গল্পগুলি বাতিল হয়ে যায়নি। কারণ কৃষকের জমির দাবি ও সশস্ত্র আন্দোলন আমাদের সমাজে একটি স্থায়ী ঘটনা। সর্বহারা শ্রেণীর এই সত্য দৃষ্টিভঙ্গি মানিকবাবু আয়ত্ত করেছিলেন বলেই সংকীর্ণ চৈতন্য তাঁর গল্পগুলিকে খারিজ করতে পারে নি।

সন্ত্রাসের ব্যাপারের মূলে প্রবেশ না-করে, আমাদের তরুণ লেখকেরা এক ধরনের সংকীর্ণ ব্যাধিতে ভুগছেন। সন্ত্রাসের জানা, না-জানা ঘাঁটিগুলি কী, তাই তাঁরা জানবার চেষ্টা করেন না। তাঁদের বহুমুখী চরিত্রগুলি ধরবারও উদ্যোগ নেই। অথচ বিষয়টি কী এতই সহজ? এর সঙ্গে দেশী ও আন্তর্জাতিক গুপ্তচরচক্রের হাতছানি কি তাঁরা দেখতে পান না? বেছে বেছে আদর্শবাদী যুবকদের হত্যা করা হল, জেলে পিটিয়ে মারা হল, পঙ্গু করা হল, আমাদের কত প্রিয় সন্তানেরা যে নিখোঁজ হল—এই ভয়ংকর বেদনার চিত্র তো আমাদের লেখকদের লেখনীতে পেলাম না। নকশাল কংশাল-মার্কা গপ্‌পো লিখে আসল ষড়যন্ত্রকে কবে তাঁরা উন্মোচন করতে শিখবেন? শিখবেন শ্রমিকশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিটি অর্জন করতে?

এই হল সন্ত্রাসের চিত্র। যেখানে আমাদের লেখকরা লক্ষ্যবস্তুকে বিদ্ধ করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না।

এর পরের প্রিয় বিষয় হচ্ছে প্রতিবাদ বা প্রতিরোধের গল্প। এই বিষয়েও লেখকদের চেতনার যে অগ্রসর ঘটেছে বলে মনে হয় না। প্রতিরোধের নামে এমন সব জ'লো কাহিনী বেরোচ্ছে যার কোনো মানেই হয় না। আজ অত্যাচার এমন সশস্ত্র জল্লাদের মূর্তিতে নেমে এসেছে তখন তার প্রতিবাদ কতটা অহিংস হতে পারে! 'জনগণই শক্তির উৎস'-এ শ্লোগানও অর্থহীন, যদি না জনগণও আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হন।

জনৈক তরুণ লেখকের গল্প পড়েছিলাম। চাষীদের সংগ্রামের বিরুদ্ধে শহর থেকে মিলিটারি গিয়ে গ্রামকে ঘিরে ফেলল। চাষীদের প্রতিরোধ চিত্র আঁকছেন লেখক। হাতে হাত জড়িয়ে কঠিন শিকলের মতো গোল হয়ে দাঁড়াল কৃষাণেরা। এই বজ্রের মতো একতা দেখে সশস্ত্র সিপাহী গ্রাম থেকে সরে পড়ল ইত্যাদি।

এ ধরনের প্রতিরোধের গল্প লেখকের মধ্যবিত্তসুলভ দুর্বলতারই পরিচায়ক। সম্ভবত মিলিটারি 'জনগণই শক্তির উৎস' থিয়োরিতে তেমন রপ্ত হয়নি, এবং রাতারাতি 'হৃদয় পরিবর্তন' ঘটে যাবে এমনটিও সম্ভব নয়। এ যেন 'গল্পের গোরু গাছে চড়ে' জাতীয় আষাঢ়ে কল্পনা। আইন মোতাবেক যদি প্রতিরোধের গল্প আজকের দিনে না-ই লেখা যায় তাহলে লেখক বন্ধুদের ও পথে না-যাওয়াই ভালো।

লেখকদের প্রিয় বিষয় হল নিগৃহীত নারীর ধর্ষণের চিত্র আঁকা। এই

জাতীয় গল্প লিখে কার উপকার হয় জানি না, তবে লেখকদের মর্ষকামী প্রবৃত্তির কিছু চরিতার্থতা ঘটে নিঃসন্দেহে। যেমন রাজনৈতিক দলের টাকা খাওয়া গুণ্ডারা মেয়েটিকে নিয়ে জঙ্গলে চলে গিয়ে পরপর ধর্ষণ করল ইত্যাকার গল্প। অত্যাচারকে প্রধান করে দেখানোর অর্থই জনগণের সংগ্রামী শক্তিকে ভয় পাইয়ে দেওয়া। এর ফলে হতাশা নৈরাশ্য আসে। অথচ বামপন্থী লেখকদের সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোনো অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য তাঁদের প্রেরণা দেয়া, উৎসাহিত করা, উদ্বুদ্ধ করা।

এলোপাথাড়ি বিষয় নির্বাচন না করে আমাদের লেখকেরা যদি লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে সচেতন হন, দায়িত্বশীল হোন, তাহলে আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গড়ে ওঠে।

লেখকের জনপ্রিয়তার সমস্যা

লেখার ব্যাপারটা ব্যক্তিমানুষের একার কাজ হলেও যেহেতু ব্যক্তি সামাজিক মানুষের অন্তর্গত সেইহেতু তাঁর সৃষ্টিকর্মের একটি স্বাভাবিক সামাজিক দিক আছেই। তা না হলে ব্যক্তিমানুষের চিন্তাভাবনা বিরাট মানুষকে প্রভাবিত করতে পারত না। তদুপরি 'সাহিত্য' কথাটির সঙ্গে যে সহিতত্ত্বের ব্যাখ্যাটি রয়েছে সেই সহিতত্ব লেখক ও পাঠকেরই।

আশা করা যায় সাহিত্যের এই তাৎপর্যে কারুরই দ্বিমত নেই। তাহলে স্বীকার করতেই হয়, লেখকের সাধনার সিদ্ধি জনপ্রিয়তায়। এমন কোনো লেখক নেই যিনি বলতে পারেন জনপ্রিয়তা আমার কাংক্ষিত নয়।

কিন্তু জনপ্রিয়তা চাইলেই কী সব লেখকের ভাগ্যে জোটে? আবার জনপ্রিয়তাই যে সেরা লেখকের মাপকাঠি এমন কথাও তেমন জোর করে বলা যায়না। আবির্ভাব মাত্র জনপ্রিয়তাও কোন কোনো লেখকের ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে সত্য বলে টেকেনি, কারণ এমনও দেখা গেছে তাঁদের জীবদ্দশাতেই শেষ জীবনে তাঁরা লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত হয়েছেন। আবার এমনও দেখা গেছে সমসময়ে উপেক্ষা পেয়ে পরবর্তীকালে সেই লেখকই অসামান্য জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। আবার উলটোটাও দেখা গেছে সমকালীন অনাদৃত লেখক ভবিষ্যতের ওপর আশা রেখেও জনপ্রিয় হননি।

এ-সম্পর্কে ধ্রুপদী দৃষ্টান্ত ভবভূতি। মহাকবি কালিদাসের তৎকালীন জনপ্রিয়তার ধারে কাছে পৌছতে না পেরে স্বয়ং ভবভূতি বিশ্বাস করেছিলেন: কালোহ্যয়ং নিরবধি বিপুলাচ পৃথ্বী—বিপুলা পৃথিবী ও নিরবধি কাল সত্ত্বেও ভবিষ্যতকালেও তিনি কালিদাসের চিরকালীন জনপ্রিয়তার নাগাল পাননি।

কাজেই দেখা যায় জনপ্রিয়তার ব্যাপারটা লেখকের পক্ষে রহস্যজনক। কেউ কেউ luck-এর কথাও তুলতে পারেন। কিন্তু একথা কখনোই বলা যায় না যে জনপ্রিয় হলেই লেখক শস্তা বা জনসাধারণের তরল রুচির কাছে বাঁধা। উদাহরণ শরৎচন্দ্র, আবির্ভাব মাত্র তিনি যে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তা সম্ভব হয়নি। সমকালে এবং শতবর্ষ পরে আজ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা হ্রাস হয়নি। অথচ একই সময়ে উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁরা আজ বিগতমহিমা। একথা বলবার ধৃষ্টতা কারুর নেই যে, নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরা কেউই কমজোরি লেখক ছিলেন।

এটা কেন হয়? কেউ কেউ বলবেন যুগের পরিবর্তন হয়েছে, পাঠকের রুচি পালটেছে। কিন্তু এ যুক্তিও সব সময় গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। যেহেতু আমি জানি এঁদের কোনো কোনো লেখা বাজারে প্রচলিত থাকলে আজকের পাঠককেও জয় করতে পারত।

তাহলে কী কথাটা এইভাবে বলা চলতে পারে যে এর জন্যে দায়ী একদিকে প্রকাশকবর্গ অন্যদিকে সাহিত্য সমালোচকগণ? আমার মনে হয় আমার এই অভিযোগের কিছু যুক্তি আছে। প্রকাশকদের কথা ছেড়ে দিলাম তাঁরা সাহিত্য সেবা করেন না, যাতে পয়সা হয় সেই ব্যবসা করেন। কিন্তু সমালোচকবর্গ? এ ব্যাপারে তাঁদের মস্ত দায়িত্ব ছিল, যা তাঁরা পালন করেন নি। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাঙলা পশ্চিম বাঙলা ভাগ হয়ে গেছে। বাঙালী দুই বঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙলা সাহিত্যকে তো এইভাবে ভাগ করা যায় না। তার ধারাবাহিকতা আছে, ক্রমবিকাশ আছে। সেখানে শুধু সংস্কারের মতো রবীন্দ্র শরৎ নজরুল সুকান্তকে নিয়েই পড়ে থাকলে চলে না। সাহিত্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবার জন্যে নরেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকদের বাদ দিলে চলবে না। অথচ পরিহাস এই, দেশ বিভাগের ওলট পালটের পর যে নতুনকালের তরুণেরা বেড়ে উঠেছেন তারা কেউই এইসব লেখকদের নাম জানেন না। কোনো সাহিত্য সমালোচক এই missing point-কে এদের চোখের সামনে তুলে ধরেন নি। রবীন্দ্রনাথের পিছনে বিশ্বভারতী আছে, শরৎচন্দ্রের পিছনে এম সি সরকার কিংবা শরৎ সমিতি, নজরুলের পিছনে বাংলাদেশ আকাডেমি, কিংবা ডি এম লাইব্রেরী, অথবা হরফ প্রকাশনী। এই সব বিস্মৃত লেখকদের পিছনে দাঁড়াবার জন্যে কোনো প্রতিষ্ঠান নেই।

তবু প্রশ্নটা সঙ্গতভাবে ওঠে যে, জনপ্রিয়তার কী একটি সর্বাত্মক চেহারা আছে? অর্থাৎ যাঁকে আমরা জনপ্রিয় বলছি তিনি কী শ্রেণীনির্বিশেষে সমস্ত মানুষের কাছেই জনপ্রিয়? আমার বিবেচনায় এ জাতীয় সর্বজনীন ব্যাখ্যা হতে পারে না। এমন দেখা যায় যাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রিয় তাঁদের কাছে শরৎচন্দ্র প্রিয় নন। আবার উলটোটাও সমান সত্যি। তার মানে এই নয় যে, কোনো লেখককে আরেকজন থেকে ছোট বড় করা যাচ্ছে। আসল

কথাটা এই, পাঠকভেদে লেখকের জনপ্রিয়তার ভিন্নতা ঘটে। শরৎ প্রেমিকরা রবীন্দ্র প্রেমিক নাও হতে পারেন। আমাদের কালে তারাশঙ্কর কারুর কাছে প্রিয় লেখক, কারুর কাছে মানিক। কাজেই আজকের সচেতন পাঠকের কাছে লেখকের জনপ্রিয়তা তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার উপরই নির্ভর করে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বড় ছোট মাঝারি যে কোনো লেখকেরই পাঠক আছে, তাঁদের কাছে তাঁরা কম জনপ্রিয় নন। এক্ষেত্রে বড় লেখক মাঝারি লেখকের প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু মজার বিষয় ভালোবাসার বিচারটা ছোট বড়র ওপর কোনোদিনই নির্ভর করেনা।

তাহলে পুনরায় ধাঁধায় পড়তে হয়। জনপ্রিয় লেখক বলতে কী এমন কাউকে বোঝাচ্ছে যিনি সমস্ত শ্রেণীর মানুষের কাছেই প্রিয়? আমার সংশয় জাগছে। বর্তমান সমাজ যখন নিয়ত শ্রেণীদ্বন্দ্বে রক্তাক্ত তখন লেখকও নিজস্ব সামাজিক অবস্থার কারণে কোনো না কোনো শ্রেণীর স্বার্থে যুক্ত। সুতরাং তার শ্রেণী স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো লেখক সে পাঠকের প্রিয় হতে পারেন না। লেখকের ভূয়সী প্রতিভা থাকা সত্বেও। শ্রেণীসংগ্রাম সচেতন পাঠকের কাছে নজরুল-সুকান্ত যতখানি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথ তত না। তার মানে এই নয় যে সচেতন পাঠক বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করছেন।

'কাজেই জনপ্রিয় লেখক' বিষয়টাই পরীক্ষা পাশের জন্য প্রদত্ত এক জাতীয় রচনা বিশেষ। বাস্তব ক্ষেত্রে এ ধরনের জনপ্রিয় লেখক পাওয়া যায় না।

আজকাল বাজারে বৃহৎ সংবাদ-পত্র গোষ্ঠী যে কায়দায় জনপ্রিয় লেখক বলে প্রচার করছেন সেটা এক তরফা। তাঁদের হাতে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্র, বহুল প্রচারিত পত্রপত্রিকা, প্রতি সপ্তাহে যদি কিছু কিছু লেখককে অনবরত পাঠকের চোখের সামনে বিজ্ঞাপনের মতো তুলে ধরা যায় তাহলে ঘষা কাচকেও একদা হীরে বলে বিশ্বাস করিয়ে দেয়া যায়। বুর্জোয়া বাজারে জনপ্রিয় লেখক এইভাবে তৈরি হয় এবং bad money drives out good অর্থনীতির এই থিয়োরিতে কানাকড়িও উত্তম রূপে বাজারচালু হয়। সচেতন পাঠক অবশ্যই স্বীকার করবেন বাণিজ্যিক কায়দায় কিছু কিছু লেখককে কিছুকাল 'জনপ্রিয়' রাখা যায়, কিন্তু এই নোংরা কায়দার বাইরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলীর বিপুল বিক্রি দেখলে আসল জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি কোথায় আছে সেটা বুঝতে দেরি হয় না।

লেখকের জনপ্রিয়তার প্রধান কথাই হচ্ছে তিনি বৃহত্তর জনস্বার্থের পক্ষে না বিপক্ষে। জনগণের সপক্ষে যে লেখক দাঁড়িয়ে থাকেন তাঁর জনপ্রিয়তা বিজ্ঞাপনের সাহায্যে বা ওপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হয় না। লেখককে স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে বৃহত্তর জনগণের স্বার্থেই সৃষ্টি করতে হয়। সেই লেখককে জনপ্রিয়তার জন্য ব্যক্তিগত অথবা প্রতিষ্ঠানগত প্রয়াস করতে হয় না।

লেখা না-লেখা

প্রকৃত লেখক যা লেখেন তার অনেক বেশি না-লেখেন। লেখা এবং না-লেখার বিষয়টাকে যিনি এক সঙ্গে মিলাতে পারেন তিনিই সার্থক লেখক। একথা ঠিক যে সৃষ্টি-প্রক্রিয়া লেখকের মস্তিষ্কে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলে। কিন্তু ওই নিয়ত-প্রক্রিয়াটিকে তিনি যে সব সময় লেখার ছাঁদে বাঁধেন এমন নয়। তাঁর সমূহ চিন্তারাশির এক ভাগও যদি লেখার রূপ পায় তাহলেই তিনি কৃতার্থ।

সুষম লেখক লেখা ও না-লেখার দু'টো অধ্যায়কেই এক সঙ্গে গ্রথিত করে লেখক জীবন অতিবাহন করেন। দু'টোরই ভারসাম্য নষ্ট হলে কেউ হন্ বহুপ্রসবী লেখক, কেউ কথক। এদেশেও এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে যাঁর লেখনীর পরিমাণ থেকে তাঁর না-লেখার কথকতার ভূমিকা প্রধান। এ কালের পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণীন্দ্রলাল বসু প্রমুখকে এক্ষেত্রে মনে পড়ে। এঁরা যা সামান্য লিখেছেন তাঁর তুলনায় এঁদের না-লেখার পরিমাণ বেশি। অন্য দিকে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রমুখের লেখার ব্যাপকতা না-লেখার থেকে অধিক।

বেশি লেখা বা না-লেখার ওপরে লেখকের ভালো মন্দ নির্ভর করছে না। কিন্তু কথাটা মানতেই হবে লেখক তাঁর সারা জীবনের চিন্তাকে কোনো কালেই সাহিত্যে রূপ দিয়ে যেতে পারেন না। যে লেখক কম লিখেছেন তার অর্থ এই নয় যে তাঁর মস্তিষ্কের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া শুদ্ধ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও তিনি আর কেন লিখলেন না সেটা ব্যক্তিগত রহস্যের উপর নির্ভর করে। যে রহস্যের সন্ধান একমাত্র সেই লেখকই দিতে পারেন।

আজকাল অর্বাচীন লেখকদের মধ্যে কিছু বাজে কথা শোনা যায়। কেউ বলেন, আমি কিছু না ভেবেই লিখি। আবার কেউ বলেন, আমি লিখতে লিখতে ভাবি। প্রথম বক্তব্যটা মিথ্যা কথা। দ্বিতীয়টি অর্ধসত্য। কারণ আগেই বলেছি লেখকের মস্তিষ্ক নিয়তই সৃজনশীল, জাগ্রত ও সজ্ঞানে কখনোই থেমে থাকে না। কাজেই লেখার টেবিলে বসার আগেই কিছু তাঁর ভাবা থাকেই এবং লিখতে-লিখতে ভাবার যে-কথাটা উঠেছে সেটা তো অনেকেই

জানেন কাগজে-কলমে রূপ দেবার সময় সৃজন-প্রক্রিয়ার ধর্মেই আগের ও পরের ভাবনার স্বভাবতই কিছু রূপান্তর ঘটে। কারণ লেখকের জীবন্ত চরিত্রগুলো তো আর নিছক পুতুল নাচের পুতুল নয়, লেখকের চেতনা-অচেতনাকে আচ্ছন্ন করে তারা নিজেদের পরিণতি গড়ে নেয়।

লেখকের লেখা এবং না-লেখার বিষয়টাতেই আবার ফিরে যাই। আমার বিবেচনায় লেখা ও না-লেখাটা সচেতন লেখকের একটি বিশিষ্ট গুণ। কোনো অংশটাই কোনোটা থেকে খাটো নয়।

প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের রসিকতাটা মনে পড়ছে। কোনো এক ওস্তাদের সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছিলেন 'বলছ তো ভালো গায়। কিন্তু থামতে জানে তো?' লেখকের সঙ্গে জনপ্রিয়তার ব্যাপারটি এমন ভাবে জড়িত যে, একবার নাম হয়ে গেলে লেখক আর লেখার প্রলোভন থামাতে পারেন না। ফলে দেখা যায় লেখক তাঁর লেখা শেষ হয়ে গেলেও নামের কাঙালপনাবশত পরবর্তীকালে এমন সব লিখতে থাকেন যা কালের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবার যোগ্য।

অনেকে হয়তো জানেন না শরৎচন্দ্রের "পথের দাবীর" আরেকটি খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল। লেখক তা পারেন নি। তাই পথের দাবীর প্রেস কপিতে তিনি মন্তব্য করে গেছেন "পথের দাবীর দ্বিতীয় ভাগ আমি যদি সম্পূর্ণ করতে না পারি আমার দেশের কেউ যেন পারে এই কামনা করি।" শ্রীকান্তের পঞ্চম পর্বও তিনি লিখে যেতে পারেন নি।

লেখক মাত্রই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন যে শরৎচন্দ্রের পক্ষে এই দুটো কাজই শেষ করে যাওয়া সম্ভব হত না। এই দুটো ইচ্ছেই তাঁর না-লেখার অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। অনেক লেখকের ক্ষেত্রেই এমন ঘটে যেখানে তাঁদের ইচ্ছা বাস্তবে রূপ নিতে পারে না। পথের দাবী কিংবা শ্রীকান্তের পরবর্তী পর্বের রূপ দেবার আগেই লেখকের মস্তিষ্কের সৃষ্টি প্রক্রিয়া অন্য চিন্তায় পটক্ষেপ করেছে। ১৯২৬-এ পথের দাবী প্রকাশের পর ১৯২৭-এ এসেছে শ্রীকান্ত তৃতীয় পর্ব, ১৯৩১-এ শেষ প্রশ্ন, ১৯৩৩-এ শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব, যেখান থেকেই তাঁর সাহিত্য পর্বের গোধুলি লগ্ন বলা যায়। ১৯২৬-এ "পথের দাবী" দ্বিতীয় ভাগ লেখার ইচ্ছেটা তাঁর না-লেখার পর্বের মধ্যেই মিশে গেছে। ১৯৩৩-এর পর তাঁর প্রধান সৃষ্টি নেই বললেই চলে। ১৯৩৬-এর শেষ দিক থেকেই তিনি অসুস্থ, যার চূড়ান্ত যবনিকা উঠল ১৯৩৮-এ।

বাঙালী লেখক জীবনের চরম দুর্ভাগ্য হচ্ছে একবার নাম হয়ে গেলে তাঁদের

নিজের ইচ্ছায় আর থামবার উপায় নেই। একদিক থেকে বড় বড় পত্রিকাগুলো তাঁকে বছরের পর বছর তাড়া দিয়ে যাবে, অন্যদিকে রয়েছে বৃহৎ প্রকাশক গোষ্ঠী। জনপ্রিয়তার মাশুল লেখককে দিতেই হবে। এবং তখন প্রায়শই আর তিনি লেখেন না, 'money writes.'

এর জন্যে সব সময় লেখককে দোষ দেয়া যায় না। তাঁর যদি অন্য জীবিকা না থাকে তাহলে তনুরক্ষার দায়েই তাঁকে কলম ঘষতে হবে। ফলে তাঁর জীবনে লেখা ও না-লেখার মধ্যে কোনো ভারসাম্য থাকে না।

তাই মনে হয় এ দেশে লেখক জীবিকা গ্রহণ সবচেয়ে মর্মান্তিক। অনন্ত প্রত্যাশা নিয়ে আরম্ভ করে অনেক লেখকই পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে যান।

কাজেই এদেশে লেখা এবং না-লেখার বিষয়টা যতটা তাত্ত্বিক আলোচনার অন্তর্ভুক্ত ততটা বাস্তবে কাজে লাগানোর ক্ষেত্র কম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও তো ভাবতে হয় সাহিত্যে পস্টারিটির কথাটাও সমান সত্য। নাকি সে কথা ভাববার মতোও লেখক আজকের দিনে দুর্লভ! এঁরা নগদ বিদায়কেই সার ভেবেছেন।

তাহলে সাহিত্যের অবস্থা কী হবে। তারাশঙ্কর বিভূতিভূষণ মানিক-সতীনাথের পর যে সাম্প্রতিক সাহিত্যের চরিত্র দানা বেঁধে উঠছে না! ভবিষ্যতকালের কাছে আমরা কী জবাবদিহি করব?

লেখক-চরিত্র

সমাজে যখন বাস করি, সমাজ থেকে যখন সবরকমের সুবিধে নিয়ে থাকি তখন সমাজের প্রতি আমার কোন দায় নেই, একথা বলবার কারুরই অধিকার নেই। কিছু কিছু লেখক এমন ভাব দেখান যেন তাঁদের পাদুটো মাটিতে স্পর্শ করে না। বানিয়ে বানিয়ে গল্প লিখে তাঁরা মনে করেন তাঁরা ইতরজনের নাগালের বাইরে বিশেষ এক সুবিধেভোগী প্রাণী। মজা মন্দ নয়। এ-সমাজে তাঁর ক্ষমতা হয়নি শুধুমাত্র লেখনীকে সম্বল করে বেঁচে থাকার। জীবিকার গরজে তাঁকে নির্দিষ্ট একটি কাজ আরো দশজন সামাজিক মানুষের মতো বেছে নিতে হয়েছে। হয় সাংবাদিক, না হয় শিক্ষক, অথবা পুস্তক প্রকাশক ব্যবসায়ী। এবং তাঁর কাজের পরিবর্তে দস্তুরমতন তিনি তাঁর মাইনে গুণে নেন, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কিংবা মাইনে বাড়ানোর মতো অশিল্পীসুলভ নেহাত স্থূল আন্দোলনও করে যান। এমনকি যাকে তিনি সাহিত্য বলে জাহির করেন তার প্রচার বা অপপ্রচার যে বৃহত্তর পাঠক সম্প্রদায়ের মর্জির সঙ্গে জড়িত তাও বিলক্ষণ জানেন। পাঠক তাঁকে নিলে খুশি হন, অনাদর করলে বিরক্ত ও হতাশ হন। তাই সাহিত্য কী বস্তু হচ্ছে তার সম্পর্কে সংশয় থাকলেও, সংশয় নেই সত্যটা সম্পর্কে যে, বইয়ের বাজার আছে ও ক্রেতা পাঠকবর্গই। অগত্যা বই কাটাবার জন্যে পাঠকরঞ্জনী বৃত্তিকে তাঁদের আশ্রয় করতে হয়। যাকে তাঁরা আদর করে বলেন পপুলার সাহিত্য।

বাজার সম্পর্কে এই অতিরিক্ত চেতনায় সাহিত্য হয়ে পড়ে পাঠককে ঘুষ দেবার জিনিস। তাঁরা বহু ব্যবহৃত কৌশল গ্রহণ করে হয় সেক্স পারভারশন কিংবা রাজনৈতিক কিস্‌সা অথবা ধর্মীয় কুসংস্কারকে কাজে লাগান। এই সব বিষয় এমন চটকদারি যে এর জন্যে লেখকের অভিজ্ঞতা, মননশীলতা, বৈদগ্ধ্য, কোনো কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সাম্প্রতিক সাহিত্যের ব্যবচ্ছেদ করলে এই উপাদানগুলিই পাওয়া যাবে।

কিন্তু এর ফলে ক্ষতি হয় সিরিয়াস সাহিত্যের। এবং লেখক চরিত্রও গড়ে ওঠেনা। লেখক-চরিত্র গড়ে না উঠলে তিনি ইতরজনের উর্ধ্বে যে আলাদা

মর্যাদা আকাঙ্ক্ষা করেন তাও পাওনা হয় না। আরো দশটা বুর্জোয়া বাজারের ফ্যাশানেবল জিনিসের মতো সাহিত্যও হয়ে ওঠে মনোহারি পণ্য।

সব লেখকই অবশ্য পাঠকদের জন্যেই লেখেন, কিন্তু সেখানে নিজের প্রধান ভূমিকাকে বাদ দিয়ে নয়। তিনি স্রষ্টা, তিনি নিজের একটা অনুভব ও চিন্তার জগৎ গড়ে তোলেন এবং সে-জগতে অগণন পাঠককে টেনে আনতে চান। আমি যা ভেবেছি, যা বিশ্বাস করেছি, আরো দশজনের অনুভবের মধ্যে আমি তা প্রতিফলিত দেখতে চাই। আমার অনুভবের সঙ্গে যত পাঠকের সাঙ্গীকরণ হয় ততই আমার সাহিত্যকর্মের সার্থকতা। পাঠকের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্যে আমাকে নেমে আসতে হয়না। যেহেতু লেখক ও পাঠক একই সমাজজীবন থেকেই তাঁদের মালমশলা কুড়িয়ে নেন সেহেতু লেখকের কোনো অনুভূতি পাঠকের বিশ্বাসযোগ্য হবে না এমন হতে পারেনা। বিশিষ্ট চিন্তাজগৎ নিয়ে একেক জন লেখক একেক রকম। কেউ রবীন্দ্রনাথ, কেউ শরৎচন্দ্র, কেউ তারাশঙ্কর, কেউ মানিক, কেউ বিভূতিভূষণ, কেউ সতীনাথ। শোনা যায়নি তাঁরা পাঠকদের সঙ্গে আপস করে মনোরঞ্জনী সাহিত্য করেছেন। তাঁরা স্বধর্মে থেকে নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে গেছেন। পাঠক সেখান থেকেই তাঁদের গ্রহণ করেছেন। এবং এই বিশিষ্ট লেখক-চরিত্রের জন্যেই তাঁরা পাঠকের কাছে আদৃত।

সাম্প্রতিককালে অধিকাংশ লেখক স্বধর্ম ভুলে ফরমায়েসি সাহিত্য শুরু করেছেন। ফলে তাঁদের লেখক-চরিত্রও পরিস্ফুট হচ্ছে না। এই ব্যক্তিত্বহীন লেখক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর মতো করুণা ও হাস্যের পাত্র হয়ে উঠছেন। আজকে একেকজন লেখক কতকগুলো ছকে পর্যবসিত হচ্ছেন। যেমন অমক লেখক সেক্স ও ভায়োলেন্স। অমুক লেখক রাজনৈতিক কিস্সা। অমুক লেখক অ্যাডোলেসেন্স, অমুক লেখক ধর্মীয় সংস্কার ইত্যাদি।

নিশ্চয়ই এই জাতীয় বাঁধা ছকে কোন লেখকের বিচার প্রশংসার্হ নয়। লেখক হিসেবে তিনি যে একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ, তাঁর যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব আছে সেটাই চাপা পড়ে. কারণ একজন লেখকের কাছে বার বার সেক্স ও ভায়োলেন্সই কেউ আশা করেন না। যেহেতু এই দিকটি ছাড়াও জীবনের আরো বিশদ পরিচয় আছে। জীবন তো ছুরিতে কাটা কেকের টুকরো নয়। শুনেছি বিদেশে কোনো কোনো চিত্রকর সারা জীবন কুকুর বা ঘোড়ার ওপর ছবি এঁকে স্পেশালাইজড্ হয়েছেন। যতদূর জানা আছে

সাহিত্যে স্পেশালাইজেশনের কোনো ব্যাপার নেই। যেমন লেখকের ব্যক্তিগত জীবন তেমনি সাহিত্যের বিশাল ক্ষেত্র ব্যাপক জীবনকে নিয়েই গড়ে ওঠে। সেখানে সেক্স আছে, প্রেম আছে, দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে, সুস্থ জীবনের জন্যে ব্যাকুলতা আছে, আর্থিক ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম আছে। এর কোনো প্রয়োজনীয় দিকগুলিকে বাদ দিয়ে কোনো একটা বিশেষ অংশকে প্রধান করে দেখালে লেখকের চেতনা খণ্ডিত ও খর্ব হতে বাধ্য। একটি দিকেরই বিশেষ প্রবণতা লেখকের সুস্থ জীবনবোধেরও পরিচয় বহন করে না।

কথাটা আবার নতুন করে বলবার চেষ্টা করি। সেটা এই, লেখক-চরিত্রের সঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট জীবনদর্শন ওতপ্রোতভাবে বাঁধা। এমন কোনো প্রধান লেখক নেই যাঁর সৃষ্টিকর্মে নিজস্ব কোনো দর্শন নেই। সে-দর্শন ভাববাদীই হোক অথবা বস্তুবাদীই হোক।

দুঃখের বিষয় সাম্প্রতিককালের লেখকদের রচনায় কোন জীবন দর্শনেরই আভাস নেই।

এর পরে কথা থাকে সৃষ্টিকর্মেরও বাইরে লেখকের সামাজিক মানুষের ভূমিকা। সেটা সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতা হরিজন হত্যা কিংবা বৃহত্তর মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক আত্মাধিকার সম্পর্কিত প্রতিক্রিয়ার প্রশ্ন। এই সমস্ত সামাজিক বিষয়ে আজকের লেখকেরা বেদনাদায়কভাবে নিশ্চুপ। যার ফলে সামাজিক মানুষের চোখে তাঁরা যেমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠছেন তেমনি তাঁদের লেখক-চরিত্রও উহ্য থাকছে।

সাহিত্যিক-সমালোচক সম্পর্ক

বিষয়টি ভাবতে গেলে উদ্বেগজনক যে, সাম্প্রতিককালে সাহিত্য সম্পর্কে সমালোচনার কোনো দায় নেই। আজকের সমালোচকগণ নিজ নিজ গবেষণার ক্ষেত্র উজ্জ্বল করে রেখেছেন এবং নিষ্ঠাবান অধ্যাপকের মতো ছাত্রদের পাঠ্যবিষয় বুঝিয়ে দিয়ে তাদের পরীক্ষা-পাশ করানোর সঙ্গেই কর্তব্য সমাধা করেন। ফলে, কেমন যেন মনে হয়, সাম্প্রতিক সাহিত্যের হিসাব নিকেশ, গুণাগুণ বিচারে সমালোচকদের কোনো শিরঃপীড়া নেই। আরো বিস্মিত হতে হয় যখন দেখা যায় সাহিত্যের অধ্যাপকেরও সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে কোনো বাস্তব ধারণাই নেই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ নিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন এবং তাঁর 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যখন তিনি সাম্প্রতিককাল নিয়ে আলোচনা করতে বসেন তখন তিনি হয় তাঁর কোনো প্রিয় ছাত্রের শরণাপন্ন হন অথবা পাইকারী হারে কেবল এলোপাথাড়ি লেখকের নামের তালিকা ছেপে দায়িত্ব এড়ান। সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে এই অজ্ঞানতার কারণেই আজ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাম্প্রতিক লেখকগণ তেমন ছাড়পত্র পেলেন না!

সাহিত্যের এমন একটা অভিভাবকহীন অবস্থা যে, বাজারে ভূরি ভূরি লেখা ভালোমন্দ নির্বিশেষে কেবলমাত্র পাঠকের অনুকম্পার উপর চলে যাচ্ছে। আবার, এই ফাঁকা মাঠ পেয়ে মুরুব্বির জোরে একদল লেখক বিজ্ঞাপনের দৌলতে বাজার মাত করবার চেষ্টা করছেন। একই গোষ্ঠীর লেখক আরেকজন লেখকের বইয়ের উচ্চ সার্টিফিকেট দিয়ে সাধারণত অসচেতন পাঠককে প্রভাবিত করছেন। কয়েক বছর আগে বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর পরিকল্পনা মতো একটি যৌনগন্ধী সচিত্র উপন্যাস শারদীয় সংখ্যায় বেরোনো মাত্র পরের সংখ্যায় সাপ্তাহিকে সেই সংস্থারই গোষ্ঠীপতি লম্বা সার্টিফিকেট দিয়ে প্রচার করলেন 'এই উপন্যাসেই বাঙলা সাহিত্যের মোড় ঘুরল ইত্যাদি।' পরের সংখ্যাতেই কিছু মন্দযশঃপ্রার্থী স্তাবক এবং পত্রিকার অনুগ্রহপ্রার্থী বশংবদ উপন্যাসের জয়গানে পত্রাঘাত করে কাগজ ভরিয়ে দিলেন। পুরো ব্যাপারটাই যে অভিসন্ধিমূলক তা আর আলাদা করে বলবার দরকার নেই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এইসব স্তাবকদের মধ্যে সমালোচনার গ্রন্থপ্রণয়েতা কিছু ধুরন্ধর অধ্যাপকও আছেন।

সাম্প্রতিককালে পক্ষপাতহীন সৎ সমালোচকের অভাবই যে বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠীর পরিচালকবর্গকে উৎসাহিত করছে বলাই বাহুল্য। তাঁরাই লেখক তৈরি করছেন, লেখককে কাহিনীর ব্লু-প্রিণ্ট সরবরাহ, করে তাঁরই ছাঁচে উপন্যাস লিখতে বলছেন, তাঁরাই আবার উচ্চপ্রশংসায় সেই উপন্যাসকে মাথায় তুলছেন, ইত্যাদি।

সমালোচকদের এই তুষ্ণীম্ভাব উদ্বেগজনক যখন আরো দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সংবাদপত্র গোষ্ঠীর এই অভিসন্ধিমূলক প্রক্রিয়ার শিকার হচ্ছেন। যেহেতু পত্রিকায় কালেভদ্রে তাঁদের রচনা ছাপা দেখার সৌভাগ্য ঘটে। সম্ভবত ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবেই তাঁরা ওই শক্তিশালী যন্ত্রটাকে ঘাঁটাতে চান না। তাই দেখি এই শ্রেণীরই অধ্যাপক সাম্প্রতিক কথা সাহিত্য ও ছোট গল্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে ওই গোষ্ঠীর লেখকদেরই নামের ফিরিস্তি ছেপে গেলেন এবং কাগজের পদের গুরুত্ব অনুযায়ী সেই সেই লেখকদের তেমন তেমন স্থান দিয়ে গেলেন। এমনকি ছোট গল্প গ্রন্থকেও উপন্যাস বলে ভুল করলেন। তবু যাই হোক যাঁদের জন্যে ওই রচনা তাঁরা খুশি হলেন। মাঝে মধ্যে সেই অধ্যাপকের কাগজে লেখার বাধা রইল না।

কিন্তু ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখতে গেলে কী যথেষ্ট লজ্জাজনক নয় যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (যাঁর জ্ঞানগরিমা সন্দেহের উর্ধ্বে) দাসত্ব করছেন পত্রিকাগোষ্ঠীর! এটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু এই কাজের ফলটা তো আর ব্যক্তিগত থাকছে না। এর ফলে তিনি সাহিত্যের জগৎটাকেই নষ্ট করছেন। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে তাঁর যে ঐতিহাসিক, সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন ছিল, তাই ব্যাহত হচ্ছে। সাহিত্যের ভবিষ্যতই বাধা পাচ্ছে। কারণ ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভেবেই তিনি নিরপেক্ষভাবে ভালো-কে ভালো, মন্দ-কে মন্দ বলতে ভয় পাচ্ছেন।

এই রকম যখন বিসদৃশ অবস্থা তখন তরুণ সাহিত্যিক যাঁরা সাহিত্যকে ব্রত হিসেবেই গ্রহণ করতে চান তাঁর কোথায় সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবেন? সাহিত্য ও অসাহিত্যের পার্থক্যই বা বুঝবেন কী করে? সেক্ষেত্রে ক্লাসিক সাহিত্যই তাঁদের পথ দেখাবে। যেহেতু এই লেখকেরা ফরমায়েসি সাহিত্য রচনা করেন নি। আর যাঁরা শস্তা ফ্যাশানের স্রোতে গা ভাসাতে চান তাঁরা সহজেই লেখা ছাপাবার ধান্ধায় সাম্প্রতিক 'বাজারে' আদর্শকেই আঁকড়াবার চেষ্টা করবেন।

সাহিত্যের সংসারে এই দুই স্তরের প্রতিযোগিতা চলবেই। সম্ভবত ফ্যাশানদুরস্তরাই কিছুকাল বাজার কব্জা করে রাখবেন। মুরুব্বির জোরে পচা মাছও সেরা বলে দর হাঁকবে।

কিন্তু কত দিন? ততদিন দেশে তন্নিষ্ঠ সাহিত্য সমালোচক প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠবে। তাঁরা অধ্যাপক না হন তাতেও যায় আসবে না। সাহিত্যের প্রগতির স্বার্থেই তাঁরা গুরু দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠ তরুণ লেখকের দল পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লেখক সত্তার মধ্যেই সমালোচক সত্তাকে আবিষ্কার করতে পারবেন। তাঁর ভেতরের নিয়ত লেখক ও সমালোচকের দ্বন্দ্বই তাঁকে একদা প্রকৃত লেখক হিসেবে দাঁড় করাবে। যেমন ভাবে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রকে করেছে।

কোথায় লিখব ?

কয়েকজন তরুণ লেখক সেদিন তাঁদের এক সমস্যা নিয়ে হাজির। বলা বাহুল্য এই লেখকেরা রাজনীতি সচেতন, নিষ্ঠাবান্, আদর্শবাদী। তাঁদের সমস্যা হল : কোন্ কাগজে লিখব, কোন্ কাগজে লিখব না! এমনকি তাঁরা এটাও চিন্তা করছেন জনসংযোগের বৃহত্তম তথা জনপ্রিয় মাধ্যম রেডিও বা টেলিভিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কি করবেন না!

যতদূর মনে হয় এ ব্যাপারে সমালোচনা উঠছে বলেই তাঁরা এখুনি এই প্রশ্নের একটি সুমীমাংসা চান।

প্রশ্নটি সত্যিই ভাববার। যেহেতু এই বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রচারের মাধ্যমগুলো মূলত বুর্জোয়াদেরই সেবা করে। এই বিচারে কোনো ভুল নেই। ফলে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী লেখকেরা ওই সব মাধ্যমে যে সুবিধা করতে পারবেন না এটা স্বতঃসিদ্ধ ঘটনা।

কিন্তু এও সমান সত্য যতদিন না সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে ততদিন ইচ্ছেয় হোক অনিচ্ছেয় হোক, এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আমাদের যেতে হবে। উদাহরণ-সহ বলতে গেলে, যেমন আমাদের অনেককেই জীবিকার প্রয়োজনে এমন চাকরি করতে হয় যার ফলশ্রুতি বুর্জোয়া ধ্যানধারণারই পোষকতা করে। সে-চাকরি মাস্টারিই বলুন, কি ওকালতিই বলুন, কিংবা দপ্তরে কেরানিগিরিই বলুন।

আরো স্পষ্ট করে বলি। আমি পেশায় একজন বাঙলার শিক্ষক। আমি ছাত্রদের কাছে পরীক্ষা পাশ-করানোর এক যন্ত্র ছাড়া কিছু নই। সিলেবাস-নামক যে-ব্লু প্রিন্টটি রাষ্ট্রনায়কেরা আমার ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন আমাকে অনেক ক্ষেত্রে অন্ধের মতো বিবেকের বিরুদ্ধে তাই নিয়ে কাজ করতে হয়। ধরুন, আমাকে একটা কবিতা পড়াতে হয়, যেখানে দেখানো হয়েছে পুরনো এক চাকর তার প্রভুর জন্যে জীবন বিসর্জন দিচ্ছেন। এই কবিতার উপদেশ কী? 'আদর্শবাদী চাকর হও।' ছাত্রদের পরীক্ষা পাশের জন্য এই আদর্শবাদই কীর্তন করতে হবে। অথচ যথার্থ শিক্ষক তাঁর ছাত্রদের কাছে কোনো দিনই এই আদর্শবাদ তুলে ধরতে পারেন না। যেহেতু কোনো আত্মসম্মানবোধ

সম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই 'আদর্শ ভৃত্য' হওয়া একটা আদর্শই নয়। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ববোধ এখানে ঘা খায়।

এই বিরূপ সমাজবিন্যাসের কারণেই আমরা চাই বা না-চাই আমাদের হাত ময়লা করতে হচ্ছে। আমরা জীবনধারণের জন্যে সমাজব্যবস্থার সঙ্গে আপস করছি, প্রচলিত কাঠামোকে দীর্ঘকাল বজায় রাখার প্রয়োজনে 'দালালি' করছি।

সমাজে থেকে সমাজের উর্ধ্বে ইচ্ছে করলেও বাস করা যায় না। তা করার ইচ্ছে থাকলে পরিণতি আত্মহত্যা। কারণ ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা এতদিনকার মজবুত সমাজ-কাঠামোকে বদলানো যায় না। তার জন্যে প্রয়োজন বিপ্লবী তত্ত্ব, বিপ্লবী রাজনীতি এবং সর্বহারা শ্রেণীর সংগঠন।

এই অবস্থায় সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে অস্বীকার করে আপনি যদি 'বিশুদ্ধ' থাকতে চান তাহলে আপনার জীবিকার ক্ষেত্রটি ছাড়তে হবে এবং আত্ম-প্রকাশের মাধ্যম যদি আপনার সাহিত্য হয়, তাহলে তাও বন্ধ করতে হবে। কিন্তু আপনার এই একক অসহযোগে ক্ষতি হবে আপনারি, সমাজের নয়। কিংবা আপনাকে নিজেই বিপ্লবী সংগঠনের কাজে হাত লাগাতে হবে। কারণ আপনার বিশুদ্ধ রচনা পরিবেশনের জন্যে চাই শোষণমুক্ত সুস্থ সমাজব্যবস্থা। ইতিমধ্যে আপনাকে যদি লিখতেই হয় তাহলে আপনাকে সজাগ হয়েই কত কম আপস করতে পারা যায় তারি চেষ্টা করতে হবে। যে-মানুষের এই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তিনি প্রয়োজনে তাঁর কর্তব্য নির্ধারণ করতে পারেন বলেই মনে হয়।

এ কথা ঠিক যে কোথায় লিখব প্রশ্নটি আপনাকে ব্যাকুল করে তুলবেই। কারণ বৃহৎ পুঁজির পত্রিকাগুলো পুঁজির মুনাফাবৃদ্ধিরই সেবা করে যাবে। পত্রিকার বুর্জোয়া চরিত্রের সঙ্গে আপনার লেখকসত্তার বিরোধ স্বাভাবিক। কারণ সেখানে আপনার বিষয়ের স্বাধীনতা নেই। সমাজপরিবর্তনকামী কোনো বক্তব্য আপনি সেখানে রাখতে পারবেন না। তা আপনি মার্কসবাদী পণ্ডিত সরোজ আচার্যই হোন কিংবা আজকের সুভাষ মুখুজ্যে, বা সমরেশ বসুই হোন। এঁরা ক্রমাগত বিরোধী শিবিরে সহবাস করতে করতে চরিত্র হারান, এমনকি আদর্শবাদ পর্যন্ত, বিবেকের তাড়নায় সাফাই স্বরূপ মূল রাজনীতিকেই অস্বীকার করে তাঁরা বলতে চেষ্টা করেন 'রাজনীতি' এক ধরনের সংকীর্ণতাবাদ, তদপেক্ষা 'মানবিকতাবাদ' অনেক বড় ইত্যাকার। প্রকারান্তরে তাঁরা

মালিকের 'বুর্জোয়া মানবতাবাদেরই' জয়ধ্বনি করে মালিকতোষণের চূড়ান্ত করেন।

কেউ যদি আত্মপক্ষ সমর্থন মানসে বলবার চেষ্টা করেন, ওঁরা আমার 'স্বাধীন' বক্তব্যে কোনো বাধা দেন না, তাহলে বলতে হবে তিনি মিথ্যেবাদী। যার খাবেন তারি দাড়ি উপড়োবেন তা একই সঙ্গে হাত পারে না।

বর্তমান লেখক নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলতে পারেন আমার 'স্বাধীনতা' ততক্ষণই গ্রাহ্য হবে যতদিন না মালিকের শ্রেণীস্বার্থ ঘা খাবে। আপনি সৎ লেখক হলে সমাজের এক ভয়ংকর মুহূর্তে আপনাকে একটি পক্ষ নিতেই হবে এবং হয়তো আপনার একটি রচনা ওই কাগজে মালিকের স্বার্থের বিরুদ্ধে একবার বেরিয়ে যেতেও পারে। কিন্তু ওই শেষ। আপনার পরবর্তী প্রয়াস নিশ্চিতই বন্ধ হবে। অসৎ লেখক হলে আপনাকে কলম ঘোরাতেই হবে। মাঝামাঝি কোনো পথ নেই। সমরেশ বসুদের কলম-ঘোরানোর ইতিবৃত্তটি এই জাতীয়। অন্য দিকে যে লেখক কলমকে বেচে দেন না তাঁর অবস্থা আমার মতোই হয়। প্রায় দশ বছর ধরে তুষারকান্তি ঘোষের 'অমৃত' সাপ্তাহিকের আমি অন্যতম প্রধান লেখক ছিলাম (কৌতুহলী পাঠক পত্রিকার জন্ম থেকে দশ বছরের ইতিহাস নিলেই তা ধরতে পারবেন)। সত্তরের দশকের বিপ্লবী মেজাজের 'এই ক্রুদ্ধ দিন'—শীর্ষক গল্পটি লেখার পরেই সে বছরই শারদীয় সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হওয়া সত্ত্বেও আমার লেখাটি 'অজ্ঞাত কারণে' বাদ দেয়া হল। আমি জানি আপস করতে চাইলে আমার সেখানে স্থায়ী ডেরা বাঁধবার অসুবিধে হত না। আমি তা করিনি, যেহেতু লেখকসত্তা বিসর্জন দিয়ে 'অমৃত' কেন 'আনন্দবাজারের' সঙ্গেও আমি সম্পর্ক রাখিনি।

এর থেকে একটা মানদণ্ড খাড়া করা যেতে পারে। যেমন কে কাকে 'ব্যবহার' করছে। আমি যদি পত্রিকাকে ব্যবহার করতে পারি তাহলে অবস্থাটা নিরাপদ। পরিবর্তে আমি যদি ওদের দ্বারা 'ব্যবহৃত' হয়ে যাই তাহলেই আমার পরাজয়।

প্রবীণ 'সচেতন' লেখক আমন্ত্রণ পেয়ে যে কাগজেই লিখুন তাঁর চরিত্র 'নষ্ট' হবার বিপদ কম থাকে। প্রবীণ লেখক মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করেন, নিজেকে ব্যবহৃত হতে দেন না।

কিন্তু তরুণদের পক্ষে এ-সুবিধে থাকে না। লেখা ফেরত আসে। এমনকি আমন্ত্রিত হলেও। কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে লেখকের বক্তব্যকে আগাপাশ-

তলা পাল্টে পত্রিকায় ছেপে দেয়া হয়েছে। লেখকের তখন ঠোঁট কামড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকে না।

ফলে এই বিপদের সম্ভাবনা থাকে বলেই 'কোথায় লিখব' সম্পর্কে তরুণদের বাছবিচার স্বাভাবিক। আমি এখানে সেই তরুণদের সম্পর্কেই বলছি যাঁরা তাঁদের লেখক চরিত্র রক্ষায় সতর্ক। সেক্ষেত্রে নিজেদের সমধর্মীদের মধ্যেই লিটল ম্যাগাজিন করে লেখা চালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ সেই কাগজে বিরুদ্ধ কোনো মালিক নেই, লেখকেরা আদর্শানুযায়ী লিখতে পারেন। অধিক প্রচার হয়না সত্যি, কিন্তু যেটুকু প্রচার হয় সেটা খাঁটি, পায়ের তলায় মাটি থাকে। সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' নামক বিখ্যাত গল্পটি 'অগ্রণী' নামক একটি লিটল ম্যাগাজিনেই বেরিয়েছিল। আসল কথা লেখা শক্তিশালী হলে তার প্রচারকে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা যায় না।

কথাটা খুব পরিষ্কার।

সমাজে দুটো শ্রেণী।

একদল প্রচলিত বিন্যাসকে রক্ষা করতে চায়। কারণ তাতেই তাদের শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে। সামাজিক সম্পদে তাদেরি একচেটিয়া অধিকার বজায় থাকে। সামাজিক স্থিতি এই ভাবে যতদিন চলবে ততদিন উপরি-তলেও একই প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট থাকবে। রাষ্ট্রকাঠামোর ওপরও কোনো আঘাত আসবে না। পরিবর্তনের বিপক্ষে এই শ্রেণী যাবতীয় বস্তুকে শাশ্বত, সনাতন, সত্য বলে ঘোষণা করবে।

অন্যদিকে আরেক শ্রেণী যাঁরা সংখ্যায় গুরু তাঁরা বিশ্বাস করেন এই প্রচলিত ব্যবস্থা মুষ্টিমেয়র স্বার্থ বহন করে। এবং যতদিন এই ব্যবস্থা বজায় থাকবে ততদিন সংখ্যাগুরু শ্রেণী সামাজিক সম্পদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।

ফলত বেশির ভাগ মানুষের সামাজিক কল্যাণের প্রয়োজনেই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়ার দরকার। এই কারণেই এঁরা সমাজ পরিবর্তনের পক্ষে।

সমাজ পরিবর্তনের অর্থ মুষ্টিমেয়র স্বার্থের বদলে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর অধিক সংখ্যক মানুষের অধিকার লাভ। রাষ্ট্রের পরিবর্তনের সঙ্গে উপরিতলের পরিবর্তন যদিও জলদে হবে না তথাপি স্থিতস্বার্থের তথাকথিত শাশ্বত, সনাতন, সত্যের ভিত আলগা হয়ে একদিন ঝুরঝুর করে ভেঙে পড়বে।

এই লড়াই দীর্ঘস্থায়ী। সম্ভবত রক্তক্ষয়ী এবং হিংস্র।

কারণ স্থিতস্বার্থ সহজে তাদের অধিকার ছেড়ে দেবে না। এই অধিকার ছাড়াব অর্থ সামাজিক বিন্যাসের ওপর প্রচণ্ড রকমের ওলট-পালট হয়ে যাবে। উপরিতলের চালচিত্রটিও ধসে পড়বে।

সোজা কথায় অন্যের শ্রমশক্তি চুরি করে যে পরশ্রমজীবী শ্রেণী এতদিন মোড়লি করে এসেছে তাদের বদলে সেই মানুষেরই প্রাধান্য হবে যারা অপরের মুনাফার সেবায় আর শ্রমশক্তি বেচবে না।

গোটা সমাজটা হয়ে উঠবে শ্রমিক শ্রেণীর নিজস্ব। নিজ বাসভূমে আর তারা নিজেদের পরবাসী মনে করবে না।

এই দুই শ্রেণীর স্বার্থের সংঘাতে স্পষ্টত দুটো শিবির ভাগ হয়ে যাবে।

এক শিবিরে বুর্জোয়া শ্রেণী আর তার তল্পিবাহক বুদ্ধিজীবী মধ্যশ্রেণী, উকিল, শিক্ষক, ডাক্তার, রাজনীতিক এবং সাহিত্যিক।

অন্য শিবিরেও রয়েছেন শ্রমিক শ্রেণী এবং তাঁদেরি বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী। সাহিত্যিক সাথীরা।

এই আলোচনায় সাহিত্যিক সম্প্রদায় নিয়েই আমরা বিচার করব।

বুর্জোয়া স্বার্থের সমর্থক লেখকদের সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সমর্থক লেখকদের ব্যাপারটা তুলনা করে দেখা যেতে পারে।

বুর্জোয়া লেখকেরা প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ছত্রছায়ায় আছেন বলে তাঁদের সামাজিক তথা আর্থিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। সাহিত্যের কোনো সামাজিক উদ্দেশ্য আছে বলে তাঁরা মনে করেন না। ফলে শিল্পের জন্যে শিল্প শ্লোগান আউড়ান। এবং সাহিত্য তাঁদের কাছে ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরির একটি পেশা ছাড়া কিছু নয়। বুর্জোয়া বাজারে শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের সহযোগে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের বইয়ের বিক্রি অধিক। এটা বাস্তব ঘটনা। এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা।

সমস্যা হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থবাহী সমাজ পরিবর্তনকামী লেখকদের।

সব লেখকের মতো এই শ্রেণীর লেখকেরাও চান তাঁরা অধিক প্রচারিত হোন্ কিন্তু সে ব্যাপারে বাধা জগদ্দল সমাজ ব্যবস্থা। তাই শ্রমিক শ্রেণীর মতোই অনুকূল সমাজব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁদেরও স্বার্থ আছে। কাজেই এখানে বুর্জোয়াদের মতো লেখকেরা ব্যক্তিগত কেরিয়ার তৈরির স্বপ্ন দ্যাখেন না। ব্যাপক সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তাঁদের সাহিত্য নিয়োজিত থাকে। এই দিকের সব লেখকদেরই সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য থাকে বলেই পরস্পর লেখকেরা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যুক্ত থাকেন। তাঁরা যৌথ দায়িত্ব পালন করেন। আত্মম্ভরী বুর্জোয়া লেখকদের মতো ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সীমাস্বর্গে আবদ্ধ থাকেন না। ফলে এখানে একটি সুস্থ সংগঠনের নেতৃত্বে লেখক আন্দোলন গড়ে ওঠে। সব দেশেই শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থবাহী লেখকদের একই চরিত্র। এখন বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের দেশের লেখকদের মধ্যে যে প্রয়োজনীয় আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে না তার

কারণ এদেশে লেনিন, মাও সে তুঙের মতো নেতৃত্ব নেই এবং গোর্কি, লু শুনের মতো সাহিত্য ক্ষেত্রে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ প্রতিভারও সাক্ষাৎ নেই। অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া সংস্কারকে কাটিয়ে আত্মনিবেদনের জন্যে বলিষ্ঠ সাহিত্যকর্মীরই অভাব।

এই অপ্রস্তুত পরিস্থিতির জন্যে দায়ী উপযুক্ত সাংগঠনিক ভূমিকা এবং সর্বহারা শ্রেণীর দর্শনটি আয়ত্ত করবার অযোগ্যতা। এদেশে মার্কসবাদকে ভিত্তি করে ছোট বড় মাঝারি বহু পার্টিই গড়ে উঠেছে। মতবাদ অভিন্ন হলেও কার্যপন্থায় পরস্পর কোনো যোগসূত্র পাওয়া যায় না। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে ভাশুর-ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। অর্থাৎ পার্টিগত কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি যত হয় আসল কাজ হয় অনেক কম। ফলে সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতটা পিতৃহীন অনাথ বালকের মতো দীন হয়ে ওঠে। সর্বহারা শ্রেণীর মূল দর্শন আয়ত্ত তথা প্রয়োগ করার ব্যাপারটা দূরেই থাকে, পার্টিগত খণ্ড খণ্ড চেতনা লেখককে সংকীর্ণ রাখে। ফলে নিজস্ব পার্টিলেখক গড়ে ওঠে এবং পার্টি আনুগত্যের কারণে একই দর্শনে বিশ্বাসী অন্য পার্টিলেখক সুনজরে থাকেন না।

নির্বাচনে এবং গদি দখলে পার্টিগুলির মিলিত প্রয়াসও সাহিত্যে মঙ্গল বৃষ্টিপাত করে না। জমি উষর ও বন্ধ্যা হয়ে থাকে। রাজনীতি ক্ষেত্রে বামপন্থী তথা গণতান্ত্রিক ঐক্যের শিক্ষা সাহিত্যে কাজ করে না। আনুষ্ঠানিক ভাবে যে সব সংগঠনের কথা শোনা যায় সেখানেও ভুল দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে সুস্থ একটা প্ল্যাটফর্ম গড়ে ওঠে না। তথাকথিত বুর্জোয়া 'হোলি অ্যালায়েন্স' কাজ করে। যার ফলে শত্রু-মিত্র বোধের অপেক্ষা, মূল শ্রেণী-শত্রুকে চিহ্নিত করবার বদলে সময়োচিত প্রয়োগবাদের শিকার হতে হয়। যার নাম প্র্যাগমাটিজম্। সবাই স্বীকার করবেন স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা সমাজ-পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী পর্ব থেকে দৃষ্টি সরিয়ে তাৎক্ষণিকের সুবিধাকে আঁকড়ে ধরতে শেখায়। যা আখেরে মার্কসবাদী ধ্যানধারণার ক্ষতিকারক। পশ্চিমী দেশের মার্কসবাদী পার্টিগুলির চেহারা দেখলেই তা ধরা পড়ে।

এই প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাহিত্যের বিষয়টা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পায় না। অ্যামেচারদের কাণ্ড কারখানায় পরিণত হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পরি-কল্পনাবিহীন রচনাগুলি বৃহত্তর জনমানুষের ওপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। ফলত সাহিত্যেরও যে সমাজ পরিবর্তনের প্রতি কোনো দায় আছে তার দিকে কোনো অঙ্গুলিনির্দেশও করে না। অনেকটা লেখালেখি খেলা করে অবসর বিনোদনের শস্তা প্রয়াস।

পুনরায় বলি সমস্ত ব্যাপারটা ঘটছে মার্কসীয় দর্শনকে আত্তীকরণ তথা প্রয়োগ না করার জন্যেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এদিকের লেখকেরা বিষয়টা বোঝেন না বা বোঝবার চেষ্টাও করেন না। যেহেতু না বুঝেও কাজ চলে যাচ্ছে, তাঁরা লেখক বনে যাচ্ছেন। অথচ বিশিষ্ট লেখক-চরিত্র গড়ে উঠছে না। যে চরিত্র স্তম্ভের মতো প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার গৌরবময় পতাকা মেলে ধরতে পারে। এটি সংঘটিত হচ্ছে না বলেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তি বলে পরিগণিত হচ্ছি না। ছাগলে মুড়ে খাচ্ছে। আমরা হতাশা ও হীনমন্যতার দাস হতে বসেছি।

এ বিষয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন সমালোচক আমাদের মধ্যে আছেন আমার ধারণা তাঁরাও সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছেন। তাঁরা লেখককে গড়ে উঠতে দেবার বদলে ঢালাও বিনা পয়সায় সার্টিফিকেট দিচ্ছেন, এই হরিলুঠের ফলে মুড়ি-মুড়কি একই দরে বিকোচ্ছে। শুধু রাজনৈতিক পার্টির প্রতি আনুগত্যের কারণে কানা লেখককেও সচল বলে বাজারে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। রচনা বিষয় ও প্রকাশে শিল্পসম্মত হয়ে উঠল কিনা সে বিচারও মুলতুবী রইল। এর ফলে উদ্দিষ্ট লেখকের স্বাভাবিক বাড় হচ্ছে না, পাকাপোক্ত হবার আগেই দরকচে যাচ্ছেন। এবং একদা ঠেস না থাকলেই ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষিপ্ত হচ্ছেন। ফলে, যখন এই শিবিরের সার্থক লেখকদের তালিকা দেবার চেষ্টা করি তখন নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। যৌথস্বার্থে কানা বেগুনও উল্লিখিত হয়ে যায়। কিন্তু এই লেখকগোষ্ঠীকে সম্বল করে প্রতিক্রিয়াশীল লেখকদের দুর্গে কামান দাগানো যায় না।

আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে লেখকদের এবং সমালোচকদের এ বিষয়ে সচেতন হবার জন্যে অনুরোধ করি। কারণ এই শিবিরের লেখকদের দায়িত্ব অপরিসীম।

সাহিত্যে ন্যাশনাল ফ্রণ্ট

কিছুকাল থেকে আমার পরিচিত অনেক তরুণ লেখক দেখা হলেই আক্ষেপ জানাচ্ছেন, সাহিত্যিকদের একটি ন্যাশনাল প্ল্যাটফরম গড়ে-ওঠা দরকার। বারবার জিজ্ঞেস করে তাঁর বক্তব্যের যে সারমর্ম বুঝতে পারলাম তাতে মনে হল, তিনি চাইছেন আরো বৃহত্তর পাঠকসমাজে প্রবেশ করতে এবং তার জন্যে চাই বড় কাগজ।

আমি অবাক হয়ে ক্ষুব্ধ লেখকের দিকে তাকিয়ে থাকি। যুবাপুরুষটি কী ভুলে গেছেন কোন সমাজে আমাদের বাস করতে হয়। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষণ কারা করেন! বাজার কার দখলে ইত্যাদি।

আসল কথা তিনি কমার্শিয়াল লেখকের ভাগ্য পেতে চাইছেন। অথচ তিনি আশা করছেন স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকবেন। কমার্শের অন্তরের কথাই হচ্ছে বাণিজ্য, বাজারে পণ্যোৎপাদন করে মুনাফা তোলাই তার ধর্ম। কমার্শিয়াল লেখকেরা এই বাজারের প্রক্রিয়ার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।

বাজারের যখন-যেমন-তখন-তেমন হাওয়া বুঝে যাঁরা লেখেন তাঁরা ব্যক্তিগত ধ্যানধারণা মতো লেখেন না। বাজারের চাহিদা মাফিক তাঁদের মাল সাপ্লাই করতে হয়। এবং এই বাজার পরিচালনা করেন মুনাফাভোগী বুর্জোয়াশ্রেণী। কারণ এঁদেরি এই সমাজ। ফলে লেখকদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য খ্যাতি প্রতিপত্তি এবং নিরাপত্তা নির্ভর করছে এই শ্রেণীরই স্বার্থের সেবা করে। সাহিত্য স্বভাবতই বাজারের আরো দশটা মনোহারি জিনিসের মতো চটুল, উত্তেজক, লোকরঞ্জক ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। অর্থাৎ এমন লেখা লেখো যাতে ক্লান্তশ্রান্ত মানুষ তার রসে আফিমের মতো বুঁদ হয়ে যায়। সেক্স? হ্যাঁ। ক্রাইম? হ্যাঁ। ধর্মীয় বুজরুকি? হ্যাঁ। রাজনৈতিক কিসসা? হ্যাঁ।

বলা বাহুল্য এইগুলিই কমার্শিয়াল সাহিত্যের লক্ষণ।

অনেকটা কারখানার পাশে মালিকের পয়সায় ভাটিখানা খুলে দেবার মতো উদার ব্যবস্থা।

মন্দকবিযশঃপ্রার্থী যুবাপুরুষ আমার ব্যাখ্যা শুনে ব্যাজার হয়ে রইলেন। আমি আন্তরিক দুঃখিত যে আমার কথাগুলো ওঁর মনঃপুত হল না।

লেখা ছাপানোর ঝোঁকে অস্থির না থেকে তিনি যদি স্বাভাবিক ভাবে তাঁর শিল্পীচৈতন্যকে বিচার করতে পারতেন তাহলে আমার কথার যাথার্থ্য ধরতে পারতেন।

ব্যাপারটা এই : কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গিতে আর 'সাহিত্য' বলে নিছক কোনো আদর্শ বেঁচে নেই। প্রকাশক, পত্রিকা, ছাপাখানা, লেখা একটা ছোট-খাটো ইনডাসট্রির বিভিন্ন নাট-বল্টু। ওই ইনডাসট্রির প্রয়োজনীয় একজন শ্রমিকের মতোই লেখার উৎপাদন করে যেতে হয়, যেখানে তাঁর ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নেই।

যে-দেবতার যে-পুজো। যিনি ওখানে যাবেন তাঁকে ওইসব মেনে নিয়েই যেতে হবে।

তা মেনে কী নেয়া যায় না? নিশ্চয়ই যায়। তা নাহলে ইনডাসট্রি চলছে কী করে? কিছু কলম-বেচা মধ্যবিত্ত কেরিয়ারিস্টই তো চিরকাল বুর্জোয়া ধ্যানধারণার সেলসম্যানশিপ গ্রহণ করেন। চালু ভাষায় যাকে বলা হয় মিড্‌লম্যান, অর্থাৎ দালাল।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে লেখকের সৃষ্টির ব্যাপারটা সত্য হলে কোনো রাজা-উজিরকে সে সেলাম করে না। গলায় শেকল পরে কখনো কেঁউ কেঁউ করলেও বুঝতে হবে সে চিৎকার মুনিবকে খুশি করার জন্যেই। সৃষ্টির প্রয়োজনীয় অহংকার যেখানে বিনষ্ট হয় সেখানে সাহিত্যিক নিজস্ব দায়িত্বে রচনা করেন বলা যায় না।

আমি জানি আমাদের পূর্বপরিচিত যুবাপুরুষের মতো কিছু হতভাগ্য আজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট জাতীয় খোয়াব দেখেন। এবং মাকুর মতো একবার বামে একবার দক্ষিণে প্রাণপণ ছুটোছুটি করছেন। সিঁড়ি ভেঙে কখনো তিনি সভাসদ সাজছেন বৃহৎ পত্রিকার ক্ষমতাবান কর্মচারী-লেখকের, কখনো আবার বামপন্থী সরকারপুষ্ট সংবাদপত্রের রবিবারের সম্পাদকের টেবিলে। এদিকের কাগজে কালেভদ্রে তিনি লেখার ব্যবস্থা একটা করে ফেলতে পারলেও দক্ষিণ মহলে বিন্দুমাত্র দাঁত ফোটাতে পারছেন না। তবু কী সিঁড়ি ভাঙার ব্যাপারে তিনি হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?

সোজা ব্যাপারটা তিনি কেন বুঝতে চান না? এই যে সেদিন তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর একটি গল্প অনায়াসে বামপন্থী কাগজে ছাপলেন। লেখাটা ছাপতে কোনো বাধাই হয়নি।

এখন তিনি কৃষক আন্দোলনের উপর অণু একটি গল্প দিয়ে আসুন না কেন দক্ষিণপন্থী কাগজে? আমি হলপ করে বলতে পারি একই লেখক ওই গল্পটি আবার বামপন্থী কাগজেই দিয়ে আসবেন। ইতিমধ্যে তিনি বয়ঃসন্ধি মার্কা ভিন্নস্বাদের গল্প দক্ষিণপন্থী কাগজে দিয়ে 'অপেক্ষা' করছেন!

রাগ করবেন না, হবু লেখকেরা আজকাল এই বিদ্যায় যথেষ্ট তৎপর। আস্ত একেকজন 'বিনয়ের অবতার', ভেতরে পাকামাথা। ব্যবসাদারকেও হার মানায়।

দেখুন ডেলি প্যাসেঞ্জার অনেক কর্মচারীই শর্টকাট করবার জন্যে দু বেলা নিষিদ্ধ গলি অতিক্রম করেই আপিসে যাতায়াত করেন। তাতে কিছু গায়ে দাগ লাগে না। কিন্তু খাতায় নাম লেখাবার ক্ষেত্রে একটা জিনিসই আপনাকে পুরনো রেকর্ডের মতো বাজিয়ে যেতে হবে। সেটা এই: 'লাল রঙ্ আমার বড় অপছন্দ'। আপনি মশায়, বামপন্থী কাগজে ট্রেড ইউনিয়নের ইনকিলাবী গপপো লিখবেন, আর দক্ষিণপন্থী কাগজের 'ভাই বেরাদার' হবেন—এ ট্রাপিজের খেলা বেশিদিন চলতে পারে না। এই আপনার সামনে ছুঁড়ে দিলাম মার্কিনী পর্নোগ্রাফি, যান বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পড়ুন, আমেরিকান-ইংরেজি বুঝতে না পারেন কোনো অধ্যাপকের কাছে কাহিনীটি জেনে নিন, তারপর বাঙালী আবহাওয়ায় লিখে ফেলুন তো একটা যুগন্ধর রগরগে উপন্যাস। আরে, পুলিশের ভয় করবেন না, দু'টো টাকা ফাইন দিলেই আপনাকে কেউ নাড়াচাড়া করবেনা। যান, কুইক মার্চ, লিখে আনুন।

কী মশায়, রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন?

আপনার না ন্যাশনাল ফ্রন্ট দরকার? বৃহত্তর পাঠকের কাছে আপনাকে পৌঁছতে হবে?

দেখুন ভাই, বুড়ো লোকের কথা শুনুন। সমাজে দু'টো শ্রেণী। দুরকম ধ্যানধারণা। দুই শিবিরই আজকাল মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। ওরাও সৈন্য সমাবেশ করেছেন, আজ হোক কাল হোক আপনাকেও শিবির চিহ্নিত করতে হবে।

এটা যত তাড়াতাড়ি বোঝেন আপনার আমার সকলের মঙ্গল।

লেখকের প্রকাশভঙ্গি

'কী লিখব'-র সঙ্গে 'কেমন করে লিখব' প্রশ্নটিকে আলাদা করে বিচার করা যায় না। প্রধান লেখকের সৃষ্টি-প্রক্রিয়ায় দুটো বিষয়ই একই সঙ্গে যুক্ত থাকে। আগে 'বিষয়' না 'প্রকাশভঙ্গি'—দুয়ের কোনটাকেই বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করা অসম্ভব। সাধারণত হালের বুর্জোয়া লেখকেরা বিষয়ের থেকে 'কেমন করে বলব'-র ওপর অধিক জোর দেন। তার কারণ লেখার বিষয়কে অপ্রধান করে তাঁরা প্রকাশরীতির ওপর গুরুত্ব দিয়ে এইটেই বোঝাতে চান যে, সাহিত্যে বিষয় নয়, প্রকাশই আসল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' থিয়োরি আবিষ্কার করেন। আর সাহিত্য নিছক প্রকাশভঙ্গির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। এমন কি 'style is the man' এই বচনে স্মার্ট প্রকাশভঙ্গিকেই তাঁরা স্টাইল বলে প্রচার করেন।

অথচ যাঁরা সৃষ্টিকর্মী, যাঁরা সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত রহস্যটি জানেন তাঁরাই স্বীকার করবেন দুটোকে ভাগ করে কোনো কালেই সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না। যদি সাহিত্যে বিষয়বস্তুর ব্যাপারটিই প্রধান হয়।

লেখক তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে যখন কোনো বিষয় নির্বাচন করেন তখনি তাঁর মনের রাজ্যে ড্রেস-রিহার্সাল চলতে থাকে এবং যেদিন কলম নিয়ে বসেন তখন বিষয়কে রূপ দিতে গিয়ে যেন অচেতন ভাবেই প্রকাশভঙ্গি আপসে এসে পড়ে। এর থেকে এই সত্যটি উঠে আসে যে, প্রকাশভঙ্গির কোনো নিরালম্ব অস্তিত্ব নেই, তা বিষয়. চরিত্র এবং পরিবেশানুযায়ী। সাহিত্যে তাকেই finished product বলা যায় যেখানে বিষয় এবং প্রকাশে পার্বতীপরমেশ্বর সম্মিলন ঘটেছে। অন্যদিকে বুর্জোয়া লেখকেরা প্রকাশের ওপর প্রধান জোর দিতে গিয়ে তাঁদের রচনা বক্তব্যহীন রীতিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে সাহিত্যে প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ত করার কৌশলকে নস্যাৎ করা হচ্ছে। সেটা শিক্ষানবীশির কাল। সার্থক লেখক গড়ে ওঠার জন্য অনুশীলনের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে।

ধরা যাক নবীন লেখক একটি বিষয়কে নির্বাচন করেছেন, দিনের পর দিন

বিষয়টি তাঁর মানসিকতাকে তাড়না করছে, কিন্তু কীভাবে তাকে প্রকাশ করবেন তার জন্য তিনি উদ্বিগ্ন।

আরো দশটি বিদ্যার মতো নবীন লেখককেও এই ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়। লেখার ইস্কুল নেই সত্যিই, কিন্তু এই ব্যাপারে প্রাথমিক পর্বে তাঁকে সাহায্য করে পূর্ববর্তী প্রধান লেখকদের অভিজ্ঞতা। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রই হোন্, রবীন্দ্রনাথই হোন, কি শরৎচন্দ্রই হোন, তারাশংকর-মানিক হলেও আপত্তি নেই। এ-ব্যাপারে আমার সুপারিশ ক্লাসিকস পঠনপাঠনের ওপরই। যেমন বিপ্লবের পর লেনিন নবীনদের জিজ্ঞাসা করে যখন জানতে পেরেছিলেন তাঁরা মায়াকভস্কি পড়ছেন তখন তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন 'আমার মনে হয় পুশকিন পড়াই ভালো' ইত্যাদি। সাহিত্যে ঐতিহ্যের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের সংস্কারকে অনুসরণ করা বোঝায় না, বোঝায় তাঁরা কীভাবে একেকটি বিষয়কে কী কৌশলে প্রকাশ করে সার্থক হয়েছেন তাকেই।

তরুণেরা অধিকাংশই প্রাথমিক পর্বে কবিতা বা ছোটগল্পকেই মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। কবিতার বিষয়ে একেশ্বর রবীন্দ্রনাথ তো আছেনই, গল্পের ক্ষেত্রেও 'গল্পগুচ্ছের' রবীন্দ্রনাথ তো অবশ্যই অনুধ্যেয়, তদুপরি আছেন বিশ্বসাহিত্যের মোপার্সাঁ, শেখভ্, গর্কি প্রমুখ প্রধান গল্পকাররা। আমার তো মনে হয় ছোট-গল্পের ক্ষেত্রে এঁরাই আমাদের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষার্থীর আগ্রহে বিশ্লেষণ করে তাঁদের লেখা বারবার না পড়লে প্রকাশভঙ্গির কৌশল আয়ত্ত করা যাবে না। তারুণ্যে এঁরাই থাকেন পথপ্রদর্শক, তারপর লেখক যতই পরিণত হতে থাকেন তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গি বা স্টাইল গড়ে ওঠে। মোপার্সাঁর প্রকাশভঙ্গি একান্ত মোপার্সাঁরই, শেখভ্ বা গর্কি স্বকীয় প্রকাশভঙ্গিতে স্বতন্ত্র। যেমন আমাদের তারাশংকর, বিভূতিভূষণ কিংবা মানিক।

এখন প্রধান লেখকদের প্রকাশ-ভঙ্গির এই যে বৈচিত্র্য তা নির্ভর করে লেখকের মানসিক গঠন, mental makeup-এর ওপর। রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাববাদী, রোমান্টিক, কবি-স্বভাবী বলে তাঁর ছোটগল্পে নির্দিষ্ট রাবীন্দ্রিকতা কাজ করেছে। নিসর্গ-সত্তা এবং গ্রামীণ নরনারীর রোমান্টিক সৌন্দর্যময়তায় তাঁর গল্পের আবহ সৃষ্টি করেছে। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র বস্তুবাদী ধারায় 'মহেশ'-এর মতো আশ্চর্য গল্প এবং 'অভাগীর স্বর্গের' মতো তুলনারহিত নির্মম ফ্যান্টাসি রচনা করে গেছেন। মানসিক গঠনের কারণেই শরৎচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গি যতটা বস্তুনির্ভর হতে পেরেছে রবীন্দ্রনাথের অজস্র ছোট গল্পে বাস্তব পটভূমি থাকলেও

সৌন্দর্য পিয়াসী কবি তাকে রবীন্দ্রময়তায় মেদুর করে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তির' মতো কৃষক জীবন-নির্ভর আশ্চর্য গল্পটিও ছোট বউয়ের মনস্তাত্ত্বিক রসে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। মানসিকতার কারণেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যেমন 'মহেশ' লেখা স্বাভাবিক ছিল না, শরৎচন্দ্রের পক্ষেও তেমনি 'শাস্তি'। তারাশংকর, বিভূতিভূষণ কিংবা মানিকের মনোভঙ্গির কারণেই তাঁদের গল্পগুলি ভিন্ন ভিন্ন আদল পেয়েছে। তারাশংকরের রাঢ় অঞ্চলের বাতাবরণ, বিভূতিভূষণের প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি সহজিয়া বোধ, মানিকের বিশ্লেষণধর্মী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার কারণেই তাঁদের গল্পগুলি স্রষ্টার বিশিষ্ট প্রকাশ-ভঙ্গি পেয়েছে। কারুর রোমান্টিক, কারুর আদর্শান্বিত, কারুর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী। শেখভ্ বা মোপাসাঁর রোমান্টিসিজম্-ন্যাচারালিজম গর্কির রোমান্টিক-রিয়ালিজিমের সঙ্গে এক গোত্রের নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে মানসিক-গঠনের কারণেই কোনো লেখকের প্রকাশভঙ্গি রোমান্টিক, কারুর রিয়ালিস্টিক। আবার লক্ষ্য করা যায় একই লেখক বিষয়ের প্রয়োজনেই কখনো রোমান্টিক ভঙ্গি আশ্রয় করেছেন, আবার কখনো রিয়ালিস্টিক। যেমন ধরা যাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে। 'অতসীমামী' গল্পে তিনি চূড়ান্ত রোমান্টিকতা করেছেন। আবার একই লেখক 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পে নির্মম রিয়ালিজিমের আশ্রয় নিয়েছেন। 'অতসী মামী'র প্রকাশভঙ্গি রিয়ালিস্টিক হতে পারত না, যেমন 'প্রাগৈতিহাসিক' রোমান্টিক ভঙ্গিতে লেখা হতে পারে না। বড় লেখকদের প্রকাশভঙ্গি এই-জন্যেই বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। তরুণ লেখকেরা কিংবা মাঝারি লেখকেরা প্রকাশভঙ্গির এই যুক্তিযুক্ততার বিষয়টি বুঝতে পারেন না সম্ভবত। তাই দেখা যায় ওঁদের প্রকাশভঙ্গি আলগা হয়ে লেগে রয়েছে—বিষয়, চরিত্রের সঙ্গে তার একাত্মতা ঘটে নি। ফলে রচনাটি সার্থক সৃষ্টিই হতে পারে নি।

লেখক যদি সচেতন না হন তাহলে এই বিষম অবস্থা ঘটতেই থাকবে। বস্তুত হালের বুর্জোয়া লেখকেরা যে জাতীয় প্রকাশভঙ্গির কথা বলেন আমাদের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। আমরা মনে করি বিষয় যখন স্বাভাবিক প্রকাশভঙ্গির সহযোগে সিদ্ধ হয়ে ওঠে তখনি তা প্রকৃত শিল্পসম্মত হয়ে ওঠে এবং তখন বিষয় চরিত্র প্রকাশ কোনটিকেই বিচ্ছিন্ন করে বিচার করার প্রশ্নই ওঠে না।

আজকের কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে

হালফিল কথাসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করতে হলে কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নেয়া সুবিধাজনক হবে। প্রধান কথাটা এই যে, লেখককে সৃজনশীল ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। জন্মগতসূত্রে এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতা না থাকলে তিনি যতই কেতাব লিখুন সত্যিকার লেখক হতে পারবেন না। সৃজনশীল লেখক তাঁর সাহিত্যের মধ্যে নিজস্ব একটি জগৎ গড়ে তোলেন, তাঁর পাঠকও অনায়াসে সেই জগতে প্রবেশ করতে পারেন। লেখক নিয়ত তাঁর সৃষ্টির জগতে পাঠককে ডেকে এনে তাঁকে অভিভূত করে দেন। শরৎচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে মানিক-তারাশঙ্কর পর্যন্ত এই সৃজনতার গুণেই তাঁদের সৃষ্ট জগতে পাঠককে এনে সহজেই বশীভূত করে ফেলেন। সাম্প্রতিক যাঁরা কথাসাহিত্য নিয়ে কারবার করেছেন তাঁদের অনেকেরই সৃজনশীলতার অভাবে তাঁরা নিজস্ব কোনো ভুবন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছেন। তার কারণ সম্ভবত বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠীর শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের ঠেস পেয়ে তাঁদের সৃষ্টিক্ষমতা যাচাই হবার আগেই তাঁরা রাতারাতি লেখক বনে যাচ্ছেন এবং যতক্ষণ পশ্চাদ্দেশে এই ঠেসটি থাকবে ততক্ষণ তাঁরা ক্রমাগত লেখক বলে কীর্তিত হবেন। কারণ সেখানে এমন একটি পাপচক্র গড়ে উঠেছে যে বই বেরোনা মাত্র ওখানকারই সতীর্থ লেখক সেই কেতাবের সার্টিফিকেট দিয়ে বসেন। বাইরের সমালোচক বা পাঠকমহলের ভালোমন্দ মতামতের মূল্য না দিয়ে ওঁদের মতামত জোর করে পাঠকদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। নির্বিরোধ পাঠকদের কথা ছেড়ে দেয়া যাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো কোনো পণ্ডিত অধ্যাপক যখন বিবেক তথা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে তাঁদেরি কোরাস বয়ে পরিণত হন তখন বুদ্ধিজীবী চরিত্রের এই স্খলন দেখে অবাক হতে হয়। বিদেশে কোনো অধ্যাপক এই ভাবে সংবাদপত্র গোষ্ঠীর মতলববাজ নষ্টচরিত্রের সঙ্গে কাঁধ মেলাতে পারেন ভাবাই যায় না। এই অধ্যাপকেরা কোনো মতে নিজের লেখা পত্রস্থ করবার গরজে তাঁদের সাহিত্যের প্রবন্ধে সংবাদপত্রের সঙ্গে যুক্ত কেবল লেখকদের নামের তালিকা মুখস্তের মতো আউড়ে দেন। বলা বাহুল্য আত্মস্তুতি কে না চায়, সেই লেখা ছাপাও হয়। হোক। কিন্তু এই প্রগল্ভার ফলে তাবৎ

সাহিত্যেরই যে ক্ষতি হয় তা সকলেই বুঝতে পারেন। তাই আমাদের কথা-সাহিত্যের আলোচনায়, এমন কি পাঠ্যপুস্তকেও ক্রমান্বয়ে, এঁদের নাম ছেপে দিয়ে অধ্যাপকেরা নিজেদের আখের গুছোন।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কী, সাহিত্যে পস্টারিটি বলে একটা কথা আছে। ওইসব খঞ্জ, পঙ্গু লেখকদের বগল থেকে ক্রাচটা যেদিন কেড়ে নেয়া হবে সেই-দিনই তাঁরা মুখ থুবড়ে পড়ে যাবেন। অন্তত সাহিত্যের ব্যাপারে যে ঠেস দিয়ে লেখক দাঁড় করানো যায় না, এটা বোঝা দরকার।

এই ঠেসের বাইরেও যথেষ্ট সৃজনশীল লেখক আছেন। যাঁদের ক্রমাগত অবহেলা করেও সাহিত্যের সংসার থেকে সরিয়ে নেয়া যায়নি। স্বাবলম্বী লেখকেরা কেবলমাত্র সৃজনশীলতার জোরে নিজস্ব পাঠক তৈরি করে ফেলেছেন।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথা লেখকের অভিজ্ঞতার বিষয়। সে ক্ষেত্রেও দেখা যায় অনেকে মনে করেন চোখ দিয়ে দেখাটাই বুঝি অভিজ্ঞতা। কিন্তু সে চোখের দেখাটা মনের রাজ্যে ছায়া না ফেললে যে সম্পূর্ণ হয় না, তা কে বলে বোঝাবে? তাই অভিজ্ঞতার নাম করে চোখ দিয়ে তাঁরা লেখেন, মন দিয়ে তা গ্রহণ করেন না। তাই অভিজ্ঞতার নাম করে তাঁরা অপ্রয়োজনীয় কিছু ডিটেলসের কাজ করেন। কিছু বিষয়ের সঙ্গে অসম্পৃক্ত প্রতীক ব্যবহার করেন, আর 'ভালো গল্প লেখেন' এই প্রচারই তাঁদের কৃতার্থ করে রাখে। কাজেই অভিজ্ঞতা যে আসলে লেখকের মানসিক অভিজ্ঞতাই এবং কেবলমাত্র তাকে সেইভাবে ব্যবহার করলেই সাহিত্যে কার্যকর হয়, এ জ্ঞান থাকা দরকার। হালফিল বহু প্রচারিত লেখকেরা মনে করেন চূড়ান্ত মদ্যপ এবং স্ত্রৈণ হলেই বুঝি অভিজ্ঞতার চূড়ান্ত হল। অথচ ভেবে দেখুন এই স্বার্থসচেতন লেখকদের চাইতে বোহিমিয়ানিজম শরৎচন্দ্রের মতো কেউ করেননি, নেশা করাই বলুন বা পতিতার সান্নিধ্যে আসা যাবতীয় ঘটনা কিছুই লুকোননি শরৎবাবু। এই বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফসল শরৎ সাহিত্য, তাঁর বিশদ অভিজ্ঞতাকে তিনি কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন লক্ষ্য করুন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য পড়লে কেউ ঘৃণায় রীরী করে উঠবেন না। আর আজকের এই লেখকেরা ভেবে অশ্লীলতা করেন বলেই তাঁদের সাহিত্য চূড়ান্ত অশ্লীল। তাঁদের সমস্ত অভিজ্ঞতা বিকারগ্রস্ত জীবের মতো বিশেষ অঙ্গে গিয়ে ঠেকেছে। এবং এরজন্য তাঁরা বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন, বরং এক ধরনের বাহাদুরি করছেন মনে করে স্ফীত হচ্ছেন। এই সংগঠিত

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে দেশের বিদগ্ধ মানুষ কী করে নীরব থাকেন সেইটেই আশ্চর্যের। এই দলেরই মুখপাত্র যখন শরৎচন্দ্রের লেখায় 'আলুর দোষ' ত্যাখেন, সেই লেখা পড়ে কারুর চৈতন্য আহত হয় না।

কাজেই কথাসাহিত্যিক হতে হলে শুধু অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট নয়, তাঁকে শিখতে হবে অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করতে। এবং তখনই ঝাড়াই বাছাইয়ের প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে। তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার পুঁজি থেকে তিনি কোনটাকে কাজে লাগাবেন সেটা নির্ভর করবে লেখকের বিশেষ দৃষ্টিকোণের ওপর। কাজেই দৃষ্টিকোণ লেখককে স্থির করে নিতে হয়। এই দৃষ্টিকোণ গঠনে লেখকের শ্রেণীনির্ভরতা এবং মানসিকগঠন কাজ করে। আমাদের লেখকেরা অধিকাংশই পেটিবুর্জোয়া বলে এই শ্রেণীর চিন্তা ভাবনা তাঁদের লেখায় আসে। আর, বিশেষ মানসিক গঠনের বিভিন্নতার কারণেই একজন ডস্টয়ভসকি হন আর-একজন টুর্গেনিভ। আমাদের দেশে যেমন তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতিভূষণ তাঁদের ভিন্ন মানসিকতায় কারণেই বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যকে প্রয়োগ করেন।

লেখকের এই দৃষ্টিকোণই পরিণামে তাঁর জীবনদর্শন গড়ে তোলে। প্রত্যেক প্রধান লেখকেরই একটি জীবনদর্শন থাকে। যেমন টলস্টয়-শেখভ্-গর্কি-হার্ডি-গলসওয়ার্দি-সার্ত্র্-কামু কিংবা আমাদের দেশের শরৎচন্দ্র-মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ। এ জীবনদর্শন বুর্জোয়া ভাববাদী দর্শনই হোক অথবা বস্তুবাদী দর্শনই হোক। মূল কথাটা হচ্ছে জীবনদর্শন ব্যতিরেকে প্রধান লেখক হওয়া যায় না।

এই বক্তব্যকে যদি আমরা যথার্থ বলে মনে করি তাহলে পরিষ্কার ঘোষণা করা যায় হালফিল লেখকদের লেখায় এই জীবনদর্শনের কোনো বালাই নেই। তাঁরা কোনো কিছু না-ভেবে একেকটা লেখা একেকভাবে লিখে যান, গপ্পো হয়, ভালো গল্পও হয়, কবিসুলভ প্রতীক-চিত্রকল্পের সুন্দর ব্যবহারও দেখা যায়, কিন্তু রচনা থেকে জীবন-দর্শনের কোনো আভাসই পাওয়া যায়না। তাঁদের উপন্যাস-বয়নের প্রয়াস নিছক ফিচার-রাইটিং-এ পরিণত হয়। ফলত জীবনদর্শনের সঙ্গে যে একটি লেখক-ব্যক্তিত্ব গড়ে-ওঠার কথা তা হয়ে ওঠেনা। এবং নার্শি-সাসের মতো তাঁরা আত্মপ্রেমে মগ্ন। উপন্যাসের পারিপার্শ্বিক, চরিত্র এবং প্রতিপাদ্যে এক ধরনের বয়ঃসন্ধিতা প্রাধান্য পায়। এবং তাঁদের শূন্যতাকে ঢাকবার জন্যে যখন তাঁরা দার্শনিকতার একটা ভান আনবার বিফল প্রয়াস করেন

তখন ইংরেজি করে বলতে ইচ্ছা করে whenever he thinks he is a child. বস্তুত অ্যাডোলেসেন্সের বাইরে তাঁদের রচনা adult-এর আদল পায়না। তাই বোধ করি যাঁদের মনের বয়স বাড়েনি সেই বয়ঃসন্ধিকালের পাঠিকারাই তাঁদের সম্বল। সমাজ-সম্পর্কে চিন্তিত গম্ভীর পাঠক যে তাঁদের স্পর্শ করেন না সেটা বোঝাই যায়।

পুনরায় বলি কেউ কেউ এঁদের ভাষা বা গল্পের বিশেষ প্রশংসায় মুখর হন। এবং এমনও সিদ্ধান্ত করেন যে, এঁদের বাইরে যে লেখকগোষ্ঠী রয়েছেন ভাষা ব্যবহারে তাঁরা তেমন দক্ষ নন। বিষয় ও চরিত্রায়নকে বাদ দিয়ে সাহিত্যে ভাষার আলাদা কোনো ভূমিকা নেই। উপন্যাসের ভাষা বিষয় ও চরিত্রানুগ। শরৎচন্দ্র বা মানিকের ভাষা নির্মাণে যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার বিচারও চরিত্রকে বাদ দিয়ে নয়। বিশেষ করে শরৎচন্দ্র সরল সাধুভাষা ব্যবহার করেও যে অসামান্য সার্থকতা অর্জন করেছেন সেখানে রবীন্দ্রনাথও পৌঁছতে পারেন নি। উপন্যাসে সংলাপ রচনা সবচেয়ে দুরূহ ব্যাপার, দেশ বিদেশের বহু প্রধান সাহিত্যিকই এ ব্যাপারে সার্থক হতে পারেন নি। আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কথাসাহিত্যে সংলাপ ব্যবহারে সফল হতে পারেন নি। শরৎচন্দ্র এ ব্যাপারে একক আদর্শ। তাঁর ভাষা, সংলাপ, বিষয় ও চরিত্রের সঙ্গে হরগৌরী সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। মানিক কী বিভূতিভূষণ সংলাপ ব্যবহারে যথেষ্ট সচেতন। হালফিল লেখকেরা বিষয় ও চরিত্রানুযায়ী ভাষা ব্যবহার করতে শেখেন নি। তাঁদের ভাষা তথা সংলাপ লেখকদের নিজস্ব ম্যানারিজমের দোষে দুষ্ট। বিষয় বা চরিত্র বিশ্লেষণে অনেক ক্ষেত্রেই তা সহায়ক হয়ে ওঠেনি। এই বিষয়টি না বুঝে যাঁরা ধরতাই বুলির মতো ওঁদের গল্পের প্রশংসা করেন তাঁরা অজ্ঞানতা বশতই তা করেন।

এই লেখকদের সম্পর্কে আমার প্রথম অভিযোগ এঁরা নিজেরা লেখেন না, money writes', সৃষ্টিক্ষম শিল্পীর অহংকার, স্বাতন্ত্র্য বর্জন করে এঁরা এস্টাব্লিশমেন্টের ক্রীতদাস বনে গেছেন। এঁরা রাজনীতি করেন না বলেও যে রাজনীতি করেন তা মালিক শ্রেণীরই রাজনীতি। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার উৎপাদনশীল ভূমিকা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এই বন্ধ্যা জগদ্দল ব্যবস্থাকে আঁকড়ে ধরে তাঁরা ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান। সমাজের পরিবর্তনশীল অংশ যে সর্বহারা শ্রেণী. তাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি গ্রহণ করতে চান না, তাঁরা প্রকাশ্যেই প্রগতিশীলতার বাহক মার্কসীয় দর্শনের প্রতি খড়্গহস্ত,

যে কোনো প্রকারে পরিবর্তনকে রোখা, মার্কসবাদকে আটকানো তাঁদের লক্ষ্য। এবং কখনো কখনো এঁরাই ছদ্ম আংরাখা পরে বিপ্লবের নাম করে বিপ্লবের সূক্ষ্ম বিরোধিতা করেন এই বলে যে "বিপ্লবে নির্দোষ লোকের প্রাণ" যায় অথবা "বিপ্লবী সংগঠনে ক্লিকবাজির কারণে কি ভাবে সৎ কর্মী খুন হন" এম্বিধ নঞর্থক প্রচার অব্যাহত রাখেন। অর্থাৎ সমাজ পরিবর্তনের মতো একটা অবজেকটিভ বিষয়কে সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে তার অপব্যাখ্যা করেন। যদিও তত্ত্ব ও প্রয়োগে মার্কসবাদের সফল অনুবাদ তাঁরা দেখেছেন রাশিয়ায়, চীনে, ভিয়েতনামে।

আমার মনে হয়, মালিকের স্বার্থে তাঁরা ইদানীং যে রাজনৈতিক বদমায়েসি শুরু করেছেন তাতে সৎ সচেতন পাঠকমাত্রই এই পতনে যুগপৎ বেদনা ও ঘৃণা বোধ করবেন।

আমাদের কথাসাহিত্যকে বস্তুবাদী ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এবং সে-প্রেরণা আমরা পাব সেকালের শরৎচন্দ্রের কাছ থেকেই। সব দেশেই এস্টাব্লিশমেণ্টের বশম্বদ একদল লেখক থাকেন, কিন্তু কালের আহারে তাঁরা একদিন জীর্ণ হন্, বেঁচে থাকেন এস্টাব্লিশমেণ্টবিরোধী লেখকেরাই, সাহিত্যের ইতিহাস তাঁরাই রচনা করেন। মার্কসবাদে দীক্ষিত মানিককে suppress করবার নানাবিধ চেষ্টাই হয়েছে, কিন্তু মৃত্যুর পরেও মানিক আজো অসামান্য জনপ্রিয়, তাঁর রচনাবলীর বিক্রির হিসেব নিলেই তা ধরা পড়বে।

বাঙলা ছোট গল্পের গতিপ্রকৃতি

বড় প্রতিভার লক্ষণ হচ্ছে তিনি তাঁর সৃষ্টিকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রাখেন। ফলে সে সৃষ্টিকর্ম তাঁর জীবদ্দশাতেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। উত্তরকালের মানুষকে সেই উপচিত সৃষ্টির দিকে শুধু বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। সেই পূর্ণভাণ্ডার থেকে কিছু নেবার থাকে না।

বাঙলাদেশে রবীন্দ্র-প্রতিভা, বিশেষ করে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে, এরি উজ্জ্বল উদাহরণ। সদর্থে আধুনিক ছোটগল্পের জন্ম-বিকাশ-পরিণতি রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বড় প্রতিভার লক্ষণ মিলিয়েই তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ গল্পসমুদ্র থেকে নতুন কিছু উপার্জন করবার জন্যে কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকেনা ভবিষ্যতের হাতে।

তাই বোধকরি দীপ্ত রবীন্দ্র পর্বেও পরবর্তী গল্প-লেখকেরা কেউ অনুসরণ করলেন না রবীন্দ্র-গল্পের ঐতিহ্যকে। কারণ নতুন লেখক হিসেবে সেটা হত মৃত্যুর সামিল। যেহেতু সরিৎ সমুদ্রে মিশলে বিশিষ্ট পরিচয় খোয়াত।

রবীন্দ্রযুগের স্পষ্ট আকর্ষণে থেকেও প্রভাত মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্ট গল্পে রবীন্দ্র-অনুসরণ করেননি। হয়তো এই ভিন্নতার কারণ লেখকদের মনোভঙ্গি এবং সমাজ সম্পর্কিত ধারণা। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি ছিলেন বলেই তাঁর কাহিনী অধিকাংশেই মূডনির্ভর, পাত্রপাত্রী সহজ আবেগের ক্রীড়নক, এবং বহুল পরিমাণে রবীন্দ্র-ময়তায় আবিষ্ট। Subjectivity যা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত ক্ষমতা, এর অভাবেই অন্য লেখকদের সৃষ্টিধর্মকে ভিন্ন ধারায় বয়ে নিয়ে গেছে। মন্ময়তাকে ছাপিয়ে তন্ময়তার দিকে কম বেশি ঠেলে নিয়ে গেছে। শুদ্ধ মূড নয়, এঁরা সাধ্যমতো কাহিনী বয়নের দিকেও নজর দিয়েছেন। কিন্তু তবু বৃহত্তর অর্থে লেখকদের একটা মিল আছে। সেইটে স্বাভাবিক মানবিকতাবোধের দিক থেকে। এই লেখকেরা মোটামুটি তথাকথিত শাশ্বত মূল্যবোধগুলি ধরে রেখেছেন। ভালো-মন্দ পাপপুণ্য দুর্বলসবল সমবেদনাসহানুভূতি অনেকটা ভালোমানুষের মতো নিরপেক্ষ। এঁরা একজাতীয় ভিক্টোরিয়ানসুলভ good old days-এর স্বপ্নে আবিষ্ট। দরিদ্র অত্যাচারিতের প্রতি এঁদের যেমন অকৃপণ দরদ, ধনীর অত্যাচার উদারতার প্রতিও তেমনি মমত্ববোধ। মনে হয় লেখক হিসেবে

এঁরা সকলেই ভালোমানুষ এবং ভালোমানুষেরা সমাজ ও মানুষকে যেমন দেখেন এঁরাও নির্বিশেষে তাই দেখছেন। এঁদের গল্পকাহিনী অনেকাংশে সেন্টিমেণ্টাল এবং হৃদয়ধর্মী। বস্তুত এঁদের চেতনা ছিল ব্যক্তির সামাস্বর্গে বাঁধা, শ্রেণী-ভিত্তিক নয়।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি একটি বিরল ব্যতিক্রম। শিল্পীর সততা সব সময়ই সামাজিক সত্যকে প্রতিভাসিত করে। গফুর নির্মম সামন্ততন্ত্রেরই বলি, চাষি থেকে মজুরে পরিণতি ঐতিহাসিক ইঙ্গিত। বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি উপন্যাসে এই লেখকই জমিদার নির্ভর মধ্যশ্রেণীর গার্বিক আকর্ষণে সেই অত্যা-চারী জমিদার শ্রেণীর উদারতার রসে নিজেকে অভিষিক্ত করে ফেলেন। অবশ্য এ-দুর্বলতা আমাদের প্রধান সাহিত্যিকদেরই।

বিংশ শতকের প্রথম দশকে য়ুরোপীয় সাহিত্যের ধারাও মোটামুটি এই পথেরই অনুসারী ছিল। কিন্তু সেখানকার এই ভিক্টোরিয়ান সন্তুষ্টি তথাকথিত good old days-এর স্টিলফ্রেম ভেঙে চুরমার হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কায়। যুদ্ধখিন্ন মানুষ দেখল তাদের অনুসৃত মূল্যবোধগুলি একটির পর একটি ক্ষয় হয়ে গলে যেতে। যে মূল কেন্দ্রে সমাজ ঘূর্ণিত হচ্ছিল সেই কেন্দ্রটি নাচতে নাচতে বৃহৎ বৃত্তাকারে ছড়িয়ে পড়ল সমাজ শরীরে। মোটরকার-মোটর বাইক আবিষ্কার মিনিটে ঊর্ধ্বশ্বাসে সমাজকে উড়িয়ে নিয়ে চলল। আজানু-আবৃত ভিক্টোরিয়ান মহিলা নেমে এলেন রাজপথে, পুরুষ-সঙ্গীর শরিক হলেন দপ্তরে আদালতে। জীবিকার প্রয়োজনে বেশবাস হ্রস্ব থেকে হ্রস্বতর হল। তথাকথিত ড্রইং রুমের আনুষ্ঠানিক প্রেম গতি খুঁজে নিল মোটরকারে মোটর বাইকে উইকএণ্ডে সমুদ্র সৈকতে কিংবা গ্রাম্য ভিলায়।

বাইরের পরিবর্তনশীলতার ছাপ মনোজীবনের আদলকেও দিল পাল্টে। তথাকথিত ধর্মচেতনা এবং স্থিতভাবের মূলে কুঠারাঘাত হানল দুটি [illegible]বাদ। ফ্রয়েডীয় যৌনবাদ, অপরটি মার্কসীয় দর্শন। সামাজিক কার্যকারণ অনুসন্ধানে একজন গেলেন libido-র কাছে, অপরজন শ্রেণী ভিত্তিক অর্থনীতির কাছে। য়ুরোপ তথা কন্টিনেন্টে ফ্রয়েড গুরুর আসন দখল করলেন। অবশ্য ধর্ম তার মান্ধাতা আমলের বর্ম নিয়ে যৌনবাদকে রুখবার চেষ্টা করেছে। হয়তো এ লড়াই আজো পর্যন্ত অব্যাহত আছে। আর মার্কসীয় দর্শনের বাস্তব প্রয়োগ ঘটল জারতন্ত্রের রাশিয়ায়।

বিশ্ব পরিস্থিতির এই চিন্তন ইংরেজী ভাষায় চোলাই হয়ে এদেশে পৌঁছল

এবং শিক্ষিত বাঙালী চেতনায় তা স্পর্শ করল। যৌনবাদকে আশ্রয় করে হ্যাভলক এলিস, লরেন্স, ন্যুট হামসুনের সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে ম্যাক্সিম গর্কির 'মাদার'-এর প্রভাবের সংমিশ্রণে যুদ্ধোত্তর নতুন সাহিত্য গজিয়ে ওঠবার সম্ভাবনা দেখা দিল। এই লেখকেরা বাঙালী মধ্যবিত্ত, বেকার, তরুণ, ছাত্র এবং বয়ঃসন্ধির শারীরিক প্রক্ষোভে দোদুল্যমান। সর্বোপরি রয়েছে সাহিত্যের পাগলামি। প্রমথ চৌধুরী ইতিমধ্যেই সাহিত্যে চলতি ভাষার অর্গল খুলে দিয়েছেন।

ধনিক রাষ্ট্রে যে পলাতক সাহিত্য চর্চার শুরু হল তা ফ্রয়েডের যৌন-কেন্দ্রিকতায়, হামসুনের প্যাগানিজম এবং মিস্টিক রোমান্টিকতায় এবং গর্কির বিপ্লবী রোমান্টিকতায় এ দেশেও গড়ে উঠল নতুন সাহিত্য। কল্লোল, কালি কলম প্রভৃতি পত্রিকার আশ্রয়ে এই সাহিত্যচিন্তা গড়ে উঠল। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্রর রচনাশৈলীতে সৃষ্ট হল এই সাহিত্যযজ্ঞ। ছোটগল্পের নতুন এক মহিমা সূচিত হল বুদ্ধদেবের দেহবাদী আত্মকেন্দ্রিক প্রেমে, অচিন্ত্যর সমাজশূন্য বোহিমিয়ানিজমে, প্রেমেন্দ্রর মধ্যবিত্ত ঘরোয়া আকৃতিতে। অন্য দিকে যুবনাশ্ব এলেন তাঁর পটলডাঙার পাঁচালী নিয়ে, নিচের তলার জীবনের ক্লেদ গ্লানি-কামুকতা সহযোগে, জগদীশ গুপ্ত অপেক্ষাকৃত নির্জন নিঃসঙ্গ। তাঁর জীবন ভঙ্গিতে এক জাতীয় বৈজ্ঞানিকসুলভ নিরাসক্তি এবং মর্বিড স্বাদ দেখা দিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ রাশিয়ান সাহিত্যের মাটি ঘেঁষা মানুষের কামনায় আত্মহারা, অন্য-দিকে অতীন্দ্রিয় রোমান্টিকতার টানে 'এরিয়ালের' ভাবানুবাদ। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বুঁদ হয়ে পড়লেন ন্যুট হামসুনের প্রকৃতিবাদে।

এই লেখকগোষ্ঠী রচনায় স্বাতন্ত্র্যসত্ত্বেও, জীবনের বাউণ্ডুলেপনা, দেহজ প্রেম এবং আত্মরতিচর্চায় আত্মীয়নিভ।

একে পরিচ্ছন্ন বিদ্রোহ বলা যেতে পারে, কিন্তু একক বিদ্রোহ।

এবং এর পিছনে সামাজিক প্রতিক্রিয়া থাকুক বা না থাকুক, ছিল মানসিক আয়োজন, এবং হয়তো কিয়দপরিমাণে রবীন্দ্র ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবার চেষ্টাকৃত প্রয়াস।

হয়তো এটা তাঁরা ভালোই করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই কল্পিত আন্দো-লনের পিছনে নির্দিষ্ট কোনো জীবনদর্শন না থাকায় তা শৌখিন উচ্ছ্বাসে হারিয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এদেশের সংস্কৃতিমণ্ডিত দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠান, তাঁর বিরোধিতা করতে গেলে ফ্যাশানগ্রস্ততার মাধ্যমে হবে না। এখানে সেখানে আধুনিকতার তালি মেরে ভঙ্গিসর্বস্ব উৎকটতা দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্র মানস দর্শনকে বুঝতে গেলে সুস্পষ্ট জীবনদর্শন দরকার। যা নির্দ্বিধায় বলা যায় এই নতুনপন্থী লেখকদের ছিল না। তাই একদা এই তরুণের অভিযান সাহিত্যের ক্ষেত্রে বয়ঃসন্ধিকাল কাটাল না। পরবর্তীকালে এই লেখকেরাই প্রবীণ হলেন এবং কী আশ্চর্য, বিনা শর্তে ঐতিহ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রতিষ্ঠাকে কিনে নিলেন। কল্লোলীয় অধ্যায়টা সাহিত্যের ইতিহাসে কতিপয় বয়ঃসন্ধি অর্বাচীনের খেয়াল হয়ে টিকে রইল।

এই অবস্থার কিছু আগে-পরে দুজন শক্তিমানের আবির্ভাব ঘটল ছোটগল্পের ক্ষেত্রে। তারাশঙ্কর ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্লোলগোষ্ঠী এই লেখকযুগলকেও তাঁদের মধ্যে দাবি করতে পারেন, যেহেতু এঁদের মানসিকতাতেও ছিল এক ধরনের রোমান্টিক সমাজ-অতিরিক্ত বৈরাগ্য।

তারাশঙ্করের বৈষ্ণবীয়ানা কিংবা বেদে যাযাবর জীবনের প্রতি অনুরাগ এবং মানিকের অতসী মামীর রোমান্টিকতা ও সমাজ-বিরোধী যূথভ্রষ্ট মানুষের ওপর আসক্তি এই স্বাক্ষর বহন করছে।

কিন্তু এহো বাহ্য। লেখক জীবনের পরিণতির সঙ্গে মনোযোগী পাঠকেরা লক্ষ্য করলেন এই লেখকদ্বয়ের ভিন্ন মেজাজ। এঁরা মৃত্তিকার কাছাকাছি আছেন এবং মানুষের জন্য দরদ এঁদের রচনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে। তবে সমাজ-দেখার ব্যাপারে তারাশঙ্কর ও মানিক পরস্পরবিরোধী। তারাশঙ্করের দৃষ্টি প্রাকৃত, মানিক জীবনকে বিরূপ চোখে দেখেন। মানিকের বিজ্ঞানসুলভ নিরাসক্তি তাঁর রচনাকে নিরাবেগ, বিশ্লেষণশীল, এবং কিয়দপরিমাণে মবিড করে তুলেছে। মনে হয় এ দিক থেকে তিনি জগদীশ গুপ্তের সমগোত্রীয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের ইমোশনাল মানুষ অতঃপর বিদায় নিলেন। এলেন ইকোনমিক মানুষ। এই পরিবর্তন নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। ইদানীং গল্পের নায়ক-নায়িকারা ক্ষুধা জৈবিকতার তাড়নায় রক্তমাংসে জীবন্ত হয়ে উঠল। এদের জীবনধারণের সঙ্গে জীবন ধারণাও আমূল পরিবর্তিত। সে মানুষ ক্ষুধার বিরুদ্ধে লড়াই করে, বিবেক বলি দেয়, স্বার্থপর হয়, ছোট হয়, প্রেম করে, লালসায় উদ্দীপিত হয়, চুরি করে, নিজস্ব দর্শন গড়ে। সর্বোপরি মানুষের সমগ্র চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়।

তারাশঙ্করের অধিকাংশ সার্থক কাহিনী গ্রামকেন্দ্রিক। কিন্তু এ গ্রাম মরমিয়া কবির চোখে আঁকা নয়। এ গ্রাম অসৎ, চতুর, লোভী-জেদী-সাহসী এবং গায়ে তার মৃত্তিকার উদগ্র গন্ধ। দোষে-গুণে, শাদায়-কালোয় বিচিত্রবর্ণ

ছোটগল্পের রাজ্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব রাজবদুন্মত্তধ্বনি সহযোগে : সুবোধ ঘোষ ছোটগল্পের ভিন্নতর স্বাদ আনলেন। ধনতন্ত্র ও বুর্জোয়া সমাজ বিন্যাসের জটিলতার শিকার মানুষগুলোর চিত্রণ শ্রেণীদ্বন্দ্বের দুঃসাহসে মূর্ত হয়ে উঠল তাঁর লেখায়। 'পরশুরামের কুঠার' কিংবা 'ফসিলের' গল্পগুলি তার নির্মম উদাহরণ।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প বিচিত্র অর্কেস্ট্রার মতো সোচ্চার হয়ে উঠল : অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারি লেখকের সৃষ্টিকর্মে উদ্ভাসিত হল। বিভূতিভূষণের গ্রামজীবনের ঘরোয়া রূপ ও নিসর্গপ্রীতি, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কখনো হাস্যরস কখনো ঋতুপ্রকৃতির সঙ্গতে স্নিগ্ধ গল্পগুলি পদ্মের মতো ঐশ্বর্য মেলে ধরল। শরদিন্দু এলেন ঐতিহাসিক রোমান্স ও গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে। শিবরাম চক্রবর্তীর লঘু হাস্যরস পরশুরামের মতো তির্যক না হলেও পান্‌এ ভরপুর।

ইতিমধ্যে দেশের আকাশে বিভিন্ন ঘূর্ণাবর্তে আলোড়ন দেখা দিয়েছে : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন সাগর পেরিয়েও এ দেশে লেলিহান হয়ে জ্বলে উঠেছে।

জাতীয় কংগ্রেস বৃহত্তর পার্টি হিসেবে এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। গান্ধীজী স্বায়ত্তশাসনের বিনিময়ে যুদ্ধে সক্রিয় সমর্থনের আওয়াজ তুললেন। বিয়াল্লিশের রক্তক্ষরা দিনগুলি, বাঙলার দুর্ভিক্ষ নিশ্চিন্ত জীবনের স্বপ্নকে উড়িয়ে নিয়ে গেল।

কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি আন্তর্জাতিক পার্টি—সাম্যবাদী পার্টি জোরদার হয়ে উঠেছে। তাদের ফ্যাসিবিরোধী সংঘ পরবর্তীকালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘে রূপান্তরিত হল। শক্তিশালী লেখকেরা এই পতাকাতলে সামিল হলেন। তারাশঙ্কর, মানিক, সুবোধ ঘোষ। অবশ্য তারাশঙ্কর ও সুবোধ ঘোষ সাম্যবাদে সন্দিহান হয়ে পববর্তীকালে গান্ধীবাদে আশ্রয় নিলেন। তারাশঙ্কর সাম্যবাদ বিরোধী কোনো কাহিনী লিখলেন না বটে, সুবোধ ঘোষ লিখলেন 'তিলাঞ্জলি'। এই প্রগতি আন্দোলনের পুরোধা হিসেবে আমরা দেখলাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নবেন্দু ঘোষ, ননী ভৌমিক, সমরেশ বসু, আশীষ বর্মণ, সুলেখা সান্যাল প্রমুখ। অরণি, পরিচয়, অগ্রণী, নতুন সাহিত্য ও দৈনিক স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে এই প্রগতিশীল আন্দোলন অব্যাহত রইল।

বিয়াল্লিশের জনজাগরণ, দুর্ভিক্ষের বীভৎসা, যুদ্ধের ক্ষুধার মধ্যে এই সমাজ

সচেতন গল্পলেখকেরা তাঁদের সাহিত্যের রসদ জোগাড় করে নিলেন। বাফল-ওয়ালের অন্ধকারে গোরা সৈন্যের নারীধর্ষণ, বেপরোয়াগতি মিলিটারী ট্রাকে নিষ্পিষ্ট দেহ, ঠিকাদারের স্ত্রী-কন্যার অর্ঘ্য, অসাধু রাজনীতিক, মধ্যবিত্ত কেরিয়ারিস্ট—সমাজজীবনের এক কদর্যমূর্তি এবং এই দুঃসময়ের ভয়ংকর আকৃতি বাণীবদ্ধ করলেন প্রগতিশীল লেখকেরা।

এঁরা অনেকেই সাম্যবাদী অথবা সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী।

যুদ্ধ ও প্রাক্-স্বাধীনতা পট এই লেখকদের জঁবস্ত লেখনীতে ইতিহাস হয়ে আছে।

এবং অতীব দুঃখের বিষয় লেখক সমাজে তখন বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতা বোধের অপেক্ষা সংকীর্ণ রাজনীতিবুদ্ধি বড় হয়ে উঠেছিল। সাম্যবাদের ধুয়ো তুলে প্রবীণ লেখকেরা আড়ালে সরে গিয়ে তথাকথিত বিশুদ্ধ সাহিত্যের চর্চা করছিলেন। সাম্যবাদের সংক্রামণ থেকে নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে স্বদেশের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করেন নি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই লেখকদের যেন স্পষ্টত দুটো শিবির গড়ে উঠল।

আজো পর্যন্ত সাহিত্যের সংসারে এই দুটো ধারা অব্যাহত রয়েছে। এবং শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পরস্পরবিরোধী এই দুই ধারাই প্রবাহিত হবে যতদিন না শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যাচ্ছে।

প্রগতি সাহিত্যে মুখোস নৃত্য

রাজনীতিতে যেমন একটা সুস্পষ্ট মেরুকরণ ঘটছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে সে চরিত্র আজো পর্যন্ত কেন গড়ে উঠল না, এ প্রশ্ন প্রায়ই আমাকে ব্যথিত করে। অথচ রাজনীতির মতো সাহিত্য-সংস্কৃতির বিষয়টি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনীতি ও সাহিত্যের ব্যাপারটা যেভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার চেষ্টা করি, আসলে দুটির সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যখন স্পষ্টত রাজনীতিকে এড়িয়ে বিশুদ্ধ সাহিত্য সেবার কথা বলে তখনও কিন্তু তারা সাহিত্যের মারফত রাজনীতি করে। ওদের এই রাজনীতির লক্ষ্য সাম্যবাদের বিরোধিতা করা। তাই প্রগতির সপক্ষে লেখকেরা রাজনৈতিক মতলবেই প্রতিক্রিয়া মহলে অচ্ছুৎ। দিনের পর দিন এই আক্রমণ সচেতন ভাবে চলেছে। ব্যবসায়িক পত্রিকা বা প্রকাশনার দ্বার প্রগতি লেখকদের সামনে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রগতির কথা বলব এবং ওদের কাগজে লিখব—এমন সুবিধে আর পাওয়া যাচ্ছে না। যেহেতু সেখানকার বাঁধা লেখক হতে গেলে প্রথম শর্তই হচ্ছে: সাম্যবাদকে অস্বীকার করা। সচেতন মানুষ একটু দৃষ্টি দিলেই ওদের এই চরিত্র ধরতে পারবেন। এমন কি একদা প্রগতিশীল যে সকল লেখক ওদের খপ্পরে পড়েছে তাদের চরিত্রকেও তারা ইতিমধ্যে হজম করেছে। আর্থিক ও আনুষঙ্গিক সুবিধে তাদের লোভের বশীভূত করে নষ্ট করে দিয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে ওদের প্রিয় বিষয় এখন যৌনতা, রাজনৈতিক কিস্‌সা এবং একজাতীয় মধুর ধর্মীয়তা। রাজনীতির নাম করে সাম্যবাদী আন্দোলনের চরিত্রকে তারা কীভাবে আক্রমণ করছে সাম্প্রতিক গল্প উপন্যাসগুলি পড়লেই ধরা যাবে। বিপ্লবী আন্দোলনের সমালোচনা অবজেকটিভ দৃষ্টিতে না-করে সাবজেকটিভ ভঙ্গিতে তারা দেখাতে চেষ্টা করছে এই সব আন্দোলনে নির্দোষ লোকের মৃত্যু ঘটে। অর্থাৎ এরা এদেশী পাস্তেরনাক বা সলজেনিৎসিনের ভাবশিষ্য। বিপ্লবের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত আমূল সামাজিক পরিবর্তন, নির্দিষ্ট নিয়মে তার সার্বিক প্রকাশ ঘটেছে রাশিয়ায়, চীনে, ভিয়েতনামে এবং তার ফলে বৃহত্তর মানুষেরই কল্যাণ ঘটেছে। কেবলমাত্র মতলববাজই বিপ্লবের এই পবিত্র তাৎপর্য অস্বীকার করে এর পিছনে "নির্দোষের মৃত্যুর" কারণ খোঁজে। বিপ্লবের

মতো সামাজিক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে লেখা এক রকম হয়, অন্যদিকে ঘটনাটিকে সাবজেকটিভ দৃষ্টিতে দেখলে লেখা আরেক রকম হয়। সমরেশ বসু যখন সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন, তখন তাঁর লেখায় এই বৈজ্ঞানিক অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি আমরা পেয়েছি। এই দৃষ্টিকে যখন তিনি এস্টাব্লিশমেণ্টকে তুষ্ট করতে বিসর্জন দিলেন তখন তিনি লিখলেন 'মানুষ', 'বিবেক' ধরনের গল্প। 'মানুষ' নভেলেটে তিনি পার্টির ব্যুরোক্রাসির ক্লিককে প্রধান করে দেখালেন। এর জন্য নেতৃ ন কর্মীকে খুন করতেও পিছপা নয়।

'বিবেক'-এ দেখালেন বিপ্লবের নাম করে নির্দোষ ফেরিওলা খুন হলে তার অসহায় স্ত্রীকে বাধ্য হয়ে জীবন ধারণের তাড়ায় বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। পার্টিতে ক্লিক নেই কিংবা নির্দোষ লোকের খুন হওয়ার সম্ভাবনা নেই এমন ব্যাপারকে কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু বিপ্লবী রাজনীতির এই গৌণ দিকগুলি তুলে ধরে সমরেশ কী প্রচার করতে চান সামাজিক বিপ্লবের প্রচেষ্টা মাত্রই খারাপ? এ মন্তব্য কী স্থিতস্বার্থেরই দালালি নয়? যে রাষ্ট্রযন্ত্র কতিপয় লোকের সম্পদ পাহারা দেবার জন্য সমাজের অধিকাংশ মানুষকে দিনের পর দিন বঞ্চিত করে চলেছে সেই পাইকারী হিংসার বিরুদ্ধে সমরেশরা চুপ। এই জগদ্দল হিংসার প্রক্রিয়াকে উচ্ছেদ করতে গেলে সংঘাত অনিবার্য এবং বেদনাদায়ক সত্য। সমাজ পরিবর্তন ছাড়া এই অন্যায়ের প্রতিকার কোনো দিন হবে না। শ্রমিকশ্রেণী অকারণ রক্তপাত ও হত্যায় বিশ্বাসী নয়, কিন্তু বুর্জোয়া শ্রেণীর কৃপণ হাত থেকে সামাজিক সম্পদ আর অন্য কীভাবে বৃহত্তর মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হবে, তার কোনো ভদ্র, সরল প্রক্রিয়া সমরেশদের জানা আছে? বুর্জোয়ারা তাদের সুযোগ সুবিধে বেশিরভাগ মানুষের ওপর ডাকাতি করে সুরক্ষিত করেছে, কোন বিনীত আবেদন নিবেদনেও সে অধিকার তারা ছাড়বে না। তাই শ্রেণী সংঘর্ষ, সংগ্রাম এবং বিপ্লবের প্রক্রিয়া।

বিপ্লবী আন্দোলনে শুধু ব্যক্তিহত্যার ব্যাপারই যাঁরা খুঁজে পান আজ, তাঁরা পরোক্ষে স্থিতস্বার্থেরই দালাল। এইভাবে একটি মহৎ আন্দোলনকে বিকৃত করে দেখার চেষ্টা এ দেশে নতুন নয়। সাহিত্যে যিনি রাজনীতির প্রবেশ পছন্দ করতেন না সেই রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত 'চার অধ্যায়' লিখে সে কালের বিপ্লবী আন্দোলনকে বিকৃত করেছিলেন! এবং দৃষ্টিভঙ্গি একই, সাবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ! শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' নয়, তার বিরুদ্ধতায় একখানি 'চার

অধ্যায়'—যার শ'য়ে শ'য়ে কপি সেকালে জেলখানায় বিপ্লবীদের মনোবল ভাঙার জন্য প্রেরিত হয়েছিল। Asia-নামক সাম্রাজ্যবাদী পত্রিকায় তার ধারাবাহিক ইংরাজি তর্জমা শুরু হল, ইত্যাদি ইত্যাদি। আর, নিষ্ঠুর পরিহাস, গ্রন্থটি প্রকাশের কালেই বিপ্লবী সূর্য সেন সাম্রাজ্যবাদী জল্লাদের হাতে প্রাণ হারালেন! কী বিস্ময়কর সাদৃশ্য সত্তরের দশকে সমাজ পরিবর্তনে বিশ্বাসী কর্মীরা যখন আত্মদানে উদ্বুদ্ধ তখন কীভাবে তাদের নির্মম ঘাতকের হাতে সঁপে দেয়া যায় তাঁরই চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছেন প্রতিক্রিয়ার দোসর এই সাহিত্যিককুল। রবীন্দ্রনাথ যেমন অগ্নিযুগের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে গেলে 'চার অধ্যায়' লিখেছিলেন সমরেশরাও তেমনি এখন শুরু করেছেন 'বিবেক' কিংবা 'মহাকালের রথের ঘোড়া' লিখতে।

গোঁড়া মার্কসবাদ বিরোধীদের বোঝা যায়, তাদের স্থির একটা চরিত্র আছে। তারা সাম্যবাদ বিরোধী এবং 'মুক্ত দুনিয়া' তত্ত্বে বিশ্বাসী। অম্লান দত্ত কিংবা সন্তোষ ঘোষকে এ ব্যাপারে চিনতে ভুল হয় না। দ্বিধা সৃষ্টি হয় যখন একদা মার্কসবাদীরা পরবর্তীকালে ভয়ংকর মার্কসবাদ বিরোধী হন। মার্কসবাদের কিছু পাঠ এঁরা গ্রহণ করেছেন বলেই সূক্ষ্মভাবে এঁরা মার্কসবাদকে আক্রমণ করতে পারেন এবং কিছু আহাম্মক পাঠক এঁদের কৌশলের ফাঁদে পড়ে সমরেশদের এখনো রাজনীতিসচেতনতা দেখে বিহ্বল হন। কর্তার হুঁকোয় ছিলিম সাজা মার্কসবাদীমন্য কোনো কোনো ব্যক্তি সমরেশদের এখনো ত্রিকালদর্শী বলে তারিফ করেন।

তার অর্থ সমরেশরা যে জিনিসটি তৈরি করতে চাইছেন তাই হচ্ছে। তাঁরা একসঙ্গে প্রগতিশীল সাজছেন এবং মার্কসবাদের সমাজ-পরিবর্তনের তত্ত্বকে ভিতর থেকে ফাঁসিয়ে দিচ্ছেন। কিছু কিছু পাঠককে তাঁরা শ্রেণী সমন্বয়ের চোরাবালিতে টেনে নামাচ্ছেন। মার্কসবাদী তকমা এঁটে যারা একদা ইন্দিরাশাহীর চৌকিদারি করতে লজ্জা বোধ করেনি সেই মহলে সমরেশরা এখনো পয়গম্বর। রতনে রতন চিনবেই তো! এই আঁতাতের কার্যকারণ বোঝা যায়। কিন্তু এর বাইরে সদর্থে যে সকল মার্কসবাদী শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী তাঁরাও যখন এই চক্রান্তকে বুঝতে না-পেরে একেক সময়ে দুর্বলতা দেখিয়ে ফেলেন তখন আমাদের কর্তব্য তাঁদের সচেতন করে দেয়া। সন্তোষ ঘোষ ও আজকের সমরেশের মূল্যায়নে এমন কোনো ভুল করা উচিত নয়। কারণ আগেই বলেছি সন্তোষ ঘোষ তাঁর মুক্ত দুনিয়ার প্রীতিকে কখনো লুকোতে

চাননি, সমরেশরা সেখানে ভঙ্গি দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা করছেন। সন্তোষ ঘোষ সেদিন সমরেশকে 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজের' পক্ষে কলম ধরতে দেননি যেহেতু সমরেশের 'প্রগতিশীল' রঙটা থাকা দরকার ছিল, যার দ্বারা প্রগতিশীল শিবিরে ভাঙন ধরানো সহজ হবে। কিছু লোককে কিছু সময়ে বোকা বানানো যায় সব লোককে পারা যায় না।

এ রকম আরেকটি চরিত্র পদাতিকের কবি সুভাষ মুখুজ্যে, মাও থেকে ম্যাওয়ে যিনি নেমে এসেছেন, যাঁর এখন সরকারী মহলে প্রচুর প্রতিপত্তি, তাঁর স্তাবকদের বেছে বেছে সরকারী পুরস্কারগুলো পাইয়ে দিচ্ছেন, আর ক্লান্ত মুহূর্তে মদ্যপান করে আত্মবিস্মৃতির চেষ্টা করছেন। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কটাক্ষ না করেও বলা যায় এই এঁদের স্বাভাবিক পরিণতি। কারণ জনবিরোধী মানুষ শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে এই ভাবেই তাঁর শূন্য জীবনকে নিঃশেষ করেন। তাঁদের জীবনের যা কিছু ভালো কাজের উপার্জন তাঁরা জীবদ্দশাতেই খরচ করে যান। তাঁদের এই অপমৃত্যু সচেতন পাঠকের কাছে বেদনা, বিস্ময় ঘৃণার সৃষ্টি করে। প্রগতিশীল আন্দোলনকে ব্যাহত করবার তাঁদের এই ভূমিকা ইতিহাসে একটি কালো দাগ রেখে যায় মাত্র

লেখক ও শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি

আত্মসমীক্ষার প্রয়োজনে স্বীকার করে নেয়াই ভালো যে আমাদের প্রগতিশীল সাহিত্য যে পরিমাণ সমৃদ্ধ হওয়ার কথা ছিল তা হতে পারেনি।

প্রগতিশীল বলতে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তাধারাকেই আমরা মনে করি। এবং আজ পর্যন্ত বিশ্বের প্রগতিশীল দর্শন মার্কসীয় দর্শন। মার্কসবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনের বয়স বিচার করলে যথেষ্ট সাবালক হয়েছে স্বীকার করতেই হয়।

তাহলে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তার সাহিত্যফ্রন্টে কোথাও কী কিছু গোলমাল থেকে গেছে? এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন রয়েছে। এমন কী ইঙ্গিত করা যেতে পারে যে, সমগ্র মার্কসবাদী আন্দোলনে পেটি বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ঢুকে গেছে। আমরা মূল শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যবহার না-করে মধ্যবিত্ত সুলভ ব্যাধিতে আক্রান্ত। যার ফলে তাবৎ মধ্যবিত্ত-শ্রমিক-কৃষক পর্যন্ত পেটিবুর্জোয়া ধ্যানধারণায় ক্লিষ্ট। একথা যেন আপ্ত বাক্যের মতো আমরা বিশ্বাস না করি যে, শ্রমিকশ্রেণী জন্মগত প্রলেতারিয়েত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মতো তাঁদেরও সচেতনভাবে প্রলেতারিয়েত হতে হয় অর্থাৎ মার্কসীয় পদ্ধতিকে আয়ত্ত করতে হয়। তারজন্য সঠিক রাজনৈতিক দীক্ষারও প্রয়োজন।

আমার বিচারে মনে হয় শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা সচেতনভাবে প্রয়োগ করতে পারিনি। না রাজনীতিতে, না সাহিত্যে। আমি যদিও সাহিত্যের লোক তা সত্ত্বেও রাজনীতির সঙ্গে এক্ষেত্রে সাহিত্যের যোগকে অস্বীকার করতে পারিনা।

সাহিত্যে সজ্ঞানে মার্কসীয় দর্শনের ব্যবহার করতে আমরা সিদ্ধ হইনি। তার কারণ আমাদের লেখকেরা যে-পরিমাণে রাজনীতিমনস্ক ততোধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে অজ্ঞান। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে চাষি-মজুর বা নিম্নবিত্তের লড়াই সমাধা করেই লেখকেরা ভেবে ফেললেন যথেষ্ট প্রগতিশীল সাহিত্য তৈরি করা গেল।

আমার মনে হয় ব্যাপারটা অত সোজা নয়। সোজা নয় বলেই রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন পাঠকের বাইরে আমাদের সাহিত্যের আবেদন বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছতে পারল না। প্রগতি সাহিত্য বলতেই চাষি-মজুর-নিম্নবিত্ত

মার্কা একটা যান্ত্রিক ছাঁচ তৈরি হয়ে গেল। এবং তাও লেখকেরা মূলত পেটি বুর্জোয়া বলে লেখায় তাঁদের শুভবুদ্ধি ছাড়া আর কিছুর পরিচয় পাওয়া গেলনা। চাষি-মজুরদের জীবনযাত্রার ওপর পেটিবুর্জোয়া শহুরে মধ্যবিত্ত লেখকেরা তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসকে খ্যাবড়া মেরে তাদের গায়ে বসিয়ে দিলেন। পাইকারী নিরক্ষরতার দেশে ভাগ্য ভালো কোনো চাষি-মজুরই আমাদের গল্পের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলেন না। আশংকা হয়, ওঁদের কাছে আমাদের লেখা পড়ে শোনাতে গেলে হয়তো হাই তুলে নাক ডাকিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন!

কাজেই নতুন করে একবার অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে সাহিত্যে কীভাবে এই দর্শনকে প্রয়োগ করা যায়। শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

তাহলে বুর্জোয়া দর্শনের কাজটা যাচাই করা দরকার। বুর্জোয়ারা ধনিক শ্রেণীর দৃষ্টিতে সমাজ এবং অন্যান্য শ্রেণীর সমস্যাগুলো বিচার করেন। বড়লোকের ধাঁচে গড়েওঠা সমাজ ব্যবস্থা, বড়লোকের শ্রেণীগত দৃষ্টিতেই যাবতীয় সমস্যার যাচাই। সেখানে ধনিকশ্রেণীর মহত্ত্ব প্রচার করা হয়, তারা ইস্কুল খুলেছে, হাসপাতাল খুলেছে, অন্যান্য আশ্রম খুলেছে, ধর্মশালা খুলেছে, এবং সময় সময় দরিদ্রনারায়ণকে সেবা করার জন্য তারা এগিয়ে এসেছে। অর্থাৎ প্রচারটা এই, বড়লোক বলে' এরা হৃদয়হীন নয়, অনুদার নয়, এদেরি দানধ্যানে বহু গরিবলোক উৎরে যাচ্ছে।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে স্থায়ী করতে চায়। অর্থাৎ সমাজে শোষক থাকবে শোষিত থাকবে, ধনী থাকবে গরিবও থাকবে, দাতা থাকবে ভিখিরিও থাকবে।

শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বিপরীত। শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব দৃষ্টিতে সে বুর্জোয়া সমাজের সমস্যাগুলির বিচার করে। সে জানে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর দখলে, যার কাজ হচ্ছে একাধারে নিজের জন্যে মুনাফার পাহাড় বানিয়ে তোলা এবং অগণিত শ্রমশক্তিকে অমানুষিক শোষণ করা। সে জানে যতদিন সমাজে ধনী দরিদ্রের স্বার্থের লড়াই থাকবে ততদিন দরিদ্রেরা শোষিত হবে। যেহেতু দারিদ্র্য সৃষ্টি করে ভিখিরি বাড়ানো এই সমাজব্যবস্থার পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম। এই শ্রমিকশ্রেণী ধনীর মহত্ত্ব খোঁজেনা, উদারতার ভানকে বরদাস্ত করেনা, তারা জানে তথাকথিত 'বুর্জোয়া মানবতা' আসলে সমাজকে অক্ষত রেখে শোষণকে অক্ষুণ্ন রাখার কৌশলমাত্র।

এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি আমরা প্রগতিশীল লেখকেরা গ্রহণ করতে পারি এবং যদি আমাদের সৃজনশীল ক্ষমতা থাকে, তাহলে আমরা ইতস্তত শরনিক্ষেপ না-করে লক্ষ্যস্থলকে প্রতিনিয়ত বিদ্ধ করতে পারব। এ কাজে অভ্যস্ত হয়ে গেলে প্রথমেই আমাদের পেটিবুর্জোয়া সুলভ চাষি মজুরের শৌখিন ব্যারিস্টার সাজার মনোভাবটাকে বিসর্জন দিতে হবে। এবং তা করতে পারলে আমাদের লেখা চাষি-মজুর-মার্কা একটি যান্ত্রিক ঢালাইয়ের বাইরে ব্যাপক মানুষের সম্পর্কিত হয়ে সমাজ-পরিবর্তনের অঙ্গীকারে সিদ্ধ হয়ে উঠবে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কী করে শিল্পসম্মতভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করা যেতে পারে! মুশকিল হচ্ছে লেখা শেখানোর কোনো ইস্কুল নেই। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে ঘাত প্রতিক্রিয়ায় অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং নিজস্ব মানসিক প্রকৃতি এবং বিশেষ একটি দৃষ্টিকোণ গ্রহণ করে লেখকসত্তা গড়ে ওঠে। পর্যবেক্ষণ, দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত লেখকের নিজস্ব। 'কী বলব'-প্রসঙ্গে 'কেমন করে বলব' বিষয়টাও তাকে ভাবতে হয়। 'কেমন করে বলব' ব্যাপারটা সহজাত নয়। তার জন্যে দরকার ক্লাসিক লেখকদের রচনা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অধ্যয়ন। অর্থাৎ একটি বিষয়কে তাঁরা কীভাবে কোন্ টেকনিক অবলম্বন করে সফল হয়েছেন। এই লেখক বুর্জোয়া শ্রেণীর হলেও আপত্তি নেই। একদা এই বিশেষ উদ্দেশ্যে ক্লাসিক সাহিত্য পড়ে আমার সাহিত্যিকসত্তা গঠনে আমি যে প্রচুর উপকৃত হয়েছি আমার পরবর্তী লেখকদের কাছে এ-সত্যটি বলে তাঁদের প্রকৃত লেখক হতে সাহায্য করতে চাই। সাহিত্যে ছোটগল্পের উপর আমার অধিক আগ্রহ বলে আমি এককালে লেখা বন্ধ রেখে মপার্সাঁ, শেখভ্, গর্কি, রবীন্দ্রনাথ, শুধু পড়িইনি, তাঁদের রচনাধারা রপ্ত করেছি। অথচ আমার পাঠকেরা স্বীকার করবেন এই মহারথিদের রচনা কৌশল স্বীকরণের স্বাভাবিক নিয়মে আমার রচনার সঙ্গে মিশে গেছে। প্রচুর পাঠক যে আমার রচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেন তারজন্য ওই মহারথিদের অগাধ ঋণ আমি নতমস্তকে স্বীকার করি। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই আমি মার্কসীয় দর্শন, যা আমাকে শ্রমিকশ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গিটাকে গ্রহণ করতে শিখিয়েছে তাকে বিসর্জন দিইনি। ব্যক্তিগত কথা বলতে হল এই কারণেই যে আমি আজো মনে করি আমার এই অভিজ্ঞতা তরুণ লেখকদের প্রয়োজনীয় রূপে গড়ে ওঠবার পক্ষে সহায়ক হবে। এছাড়া প্রগতিশীল সার্থক লেখক হবার দ্বিতীয় রাস্তা আমার জানা নেই।

দুঃখ হতাশা সংক্রান্ত লেখা

সমাজের অধিকাংশ মানুষের জীবনে দারিদ্র্য, দুঃখ, হতাশা একটা পরিচিত বিষয়। বামপন্থী লেখকদেরও দীর্ঘকাল এইগুলি তাদের রচনার প্রিয় বিষয়। আশ্চর্যের কথা দক্ষিণপন্থী লেখকরাও একই বিষয় অন্বেষণ করে লিখতে ভালোবাসেন। তাহলে আর পরস্পর বিপরীত শিবিরের লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গির গুণগত কী পার্থক্য রইল ?

অথচ পার্থক্য থাকা উচিত। যেহেতু বামপন্থীরা সর্বহারা শ্রেণীর দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁরা দুঃখ হতাশাকে চিরকালীন একটা অবস্থা বলে মনে করেন না। তাঁরা জানেন ধনিক শ্রেণীর সমাজব্যবস্থায় সামাজিক সম্পদকে কুক্ষিগত করার প্রয়াসের মধ্যেই দারিদ্র্যের কারণ নিহিত। তাই সমাজ পরিবর্তন ছাড়া দারিদ্র্য দূর হবেনা।

তাই দুঃখ-জাতীয় একই বিষয় নিয়ে দুই শিবিরের লেখকেরা লিখলেও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। দুঃখের চিত্রকে তাঁরা ন্যাচারালিজমের লেখনীতে আঁকবেন না, কৃত্রিম এই দুঃখের কারণকে উত্তীর্ণ করবার প্রয়াসে যে ব্যবস্থা অধিক মানুষকে এই অবস্থায় ফেলেছে তার প্রতি অকম্পিত শ্রেণীঘৃণা জানাবেন। তা না হলে মানুষ সহজেই নপুংসক ভাগ্য এবং অদৃষ্টবাদের শিকার হবেন। দীর্ঘকাল ধরে যা মানুষকে করেছে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি বামপন্থী লেখকেরা যত দ্রুত গ্রহণ করতে পারেন ততই তাঁদের রচনা সমাজ পরিবর্তনের তাৎপর্যের সঙ্গে অন্বিত হবে। অবশ্যই বলাটা যত সহজ লেখার ব্যাপারটা তত সহজ নয়। অন্তত সমাজমনস্ক শক্তিশালী স্রষ্টা না হলে একাজ অন্যের পক্ষে দুরূহ। দুরূহ বলেই এই মহলের গল্পেও দুঃখের স্বাভাবিক উত্তরণ হচ্ছে না। দুঃখ-বিষয়ক রচনায় এখনো দেখা যাচ্ছে মানুষ আত্মহত্যা করছে, মস্তান হচ্ছে, দালালি করছে, আর দুঃখী মেয়েরা অবলীলায় দেহদান করছেন।

লেখকেরা প্রশ্ন করবেন, সমাজে এই চিত্র কি নেই ? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যে মানুষ একাজ করছেন তিনি 'একা', তিনি মনে করতে পারছেন না এই কাজে প্রতিনিয়ত তাড়না করছে বিমুখ এই সমাজ ব্যবস্থা। যদি মনে করতে

পারতেন তাহলে সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে নির্ভুল অভিশাপ তিনি উচ্চারণ করতেনই। এই উচ্চারণের সঙ্গে তিনি যে একক নন, সামাজিক সত্তারই একটি অংশ সেটা অনুভব করতেন।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পেরই সার্থক দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। সামন্ততান্ত্রিক অমানুষিক শোষণে গফুর সর্বস্বান্ত হয়ে শেষকালে গলায় দড়ি দিয়েই জীবনজ্বালা জুড়োতে পারতেন! লেখক তা করলে কিছু অসত্য ব্যাপার হতনা। কারণ দুঃখে অনেক মানুষ তো আত্মহত্যা করেই। পাঠকদের গর্বের কথা শরৎচন্দ্র নির্যাতিত দরিদ্র কৃষককে নিয়ে গেলেন আর এক ঐতিহাসিক সত্যে, তার উত্তরণ হল পাটকলের মজুরের জীবনে। লেখক সচেতন ভাবেই চরিত্রের এই উত্তরণ ঘটাতে পেরেছেন। অথচ মজার ব্যাপার, লেখকের ইচ্ছাপূরণের কাহিনী নয়, কিংবা গফুরের এই পরিণতি যান্ত্রিক সিদ্ধান্তেরও ফল নয়।

দুঃখের মতো হতাশার ব্যাপারটাও একই ধরনের। এই হতাশার প্রসঙ্গ টেনে দক্ষিণপন্থী লেখকেরা বিচ্ছিন্নতাবাদের দর্শন আওড়ান। এবং চূড়ান্ত ফ্রাসট্রেশনের গাড্ডায় মানুষকে নিয়ে গিয়ে ফেলেন।

আবার স্মরণ করাতে চাই, সামাজিক স্রোত থেকে নিজেকে আলাদা করে দেখতে গেলেই এ সমাজে কোনো সমস্যারই সমাধান মিলবে না। নিঃসঙ্গ মানুষ সমস্যাটিকে একা সমাধান করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে শেষে নিজের জীবনের যে পরিণতি টানেন তা একান্তই ব্যক্তিক্। সামাজিক কার্যকারণ সম্পর্কে যিনি বেশি সচেতন তিনি হতাশা নামক ব্যাধিতে আটকা পড়েন না। এই বড়-লোকের সমাজে সংখ্যায় অধিক গরিবশ্রেণী সমস্ত অধিকার থেকেই বঞ্চিত, এর-জন্য তাঁর পূর্বজন্মের কর্মফল বা অদৃষ্ট দায়ী নয়। যিনি সামাজিক ব্যাপারটা জানেন তাঁর পক্ষে ফ্রাসট্রেশন-বিলাস সম্ভব নয়। বামপন্থী সচেতন লেখক বিষয়টা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হলে তাঁর রচনায় হতাশাবাদ ছায়া ফেলতে পারে না। তার অর্থ এই নয় যে, হতাশাবাদকে কাটাতে গিয়ে তিনি উপর থেকে একটা আশাবাদ থ্যাবড়া মেরে বসিয়ে দেবেন। গর্কির 'মাদার'-এ শ্রমিক আন্দোলন জয়যুক্ত হতে পারেনি, হারের চিত্র এঁকেও গর্কি নৈরাশ্য ছড়াননি, সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়েছে শ্রমিক, আগামী জয়ের ইঙ্গিতও লেখক দিতে ভুল করেননি। যে ইঙ্গিতকে বলা হয় বিপ্লবী রোমান্টিকতা।

কথাটা জোর করে বলার দরকার আছে, হেরে যাওয়ার দৃশ্য দেখালেই যে হতাশাবাদ দেখান হয় তা নয়, অন্যদিকে বিষয়-অতিরিক্ত আশাবাদের আলগা

শ্লোগানবাজী করলেই প্রগতিশীল কর্ম হয় না। ধরা যাক আমাদের কোনো লেখক কাকদ্বীপ বা তেলেঙ্গানার সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে গল্প লিখলেন, সেখানে লেখক জোর করে নিশ্চয় জয়ের চিত্র আঁকতে পারবেন না, কিন্তু কৃষকের জমি-দখলের সশস্ত্র আন্দোলনের ঐতিহাসিক সত্যকে তুলে ধরতে কোনো বাধা নেই। তেভাগা-আন্দোলনকে আশ্রয় করে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের সংগ্রামী সত্য দীর্ঘকালীন প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। বিষয়টা মনে রাখা লেখকের পক্ষে মঙ্গলের হবে, লড়াইয়ে হারজিত আছে, সব হারই হতাশাব্যঞ্জক নয়, যদি অবজেকটিভ ভঙ্গিতে তা লেখা যায়।

অভাবগ্রস্ত মেয়েদের দেহদানের ব্যাপারটা দক্ষিণপন্থীদের মতো বামপন্থী লেখকদেরও একটা শস্তা প্রলোভন। যেদিন থেকে মেয়েরা প্রাধান্য হারিয়েছেন পুরুষশাসিত ফিউডাল বা বুর্জোয়া সমাজে তাঁরা আরো দশটা ভোগ্যবস্তুর মতো পণ্যে পরিণত হয়েছেন। দেহদান একটা রোজগারও বটে। আমাদের লেখকেরা এর অন্তর্নিহিত সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে যাননা। বারবার প্রতিক্রিয়াশীলদের মতো এই কায়দাটাকে ব্যবহার করে শস্তায় কিস্তিমাৎ করতে চান; বোঝেন না যে, এতে গোটা নারীজাতিকেই অপমান করা হয়। দক্ষিণপন্থী লেখকেরা যে ভঙ্গিতে দেহদানের ব্যাপারটা তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেন তাতে মনে হয় যেন মেয়েরা অভাবে কখনো স্বভাবে এই পথে নামেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি স্বভাবতই মেয়েদের দিক থেকে যত নয় তত পুরুষদের দৃষ্টিতে। এইসব লেখকদের ব্যক্তিগত জীবনধারণের যে ছক তাতে মেয়েদের ওইভাবে নিগৃহীত করতে তাঁদের ভেতরের মর্ষকামই তৃপ্ত হয়। এই ব্যাপারে মেয়েদের মানসিক কোনো প্রতিরোধ নেই, যেন পুরুষদের এই দুর্বলতাকে তাঁরাও মূলধন করেন; এমনকি ধর্ষিতার চরিত্র আঁকতে গিয়েও মেয়েদের স্বভাবত ধর্ষিতা-প্রবৃত্তির ইঙ্গিতও তাঁরা করেন। ফলে সমস্ত বিষয়টা একজাতীয় দুরারোগ্য ব্যাধির মতো চিত্রিত হয়।

এই ধরনের বিষয় লিখতে গেলে আমাদের লেখকদের যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। যেন ব্যাপারটা প্যাথলজিকাল ট্রিটমেন্টে না দাঁড়ায়।

একই লেখক এই বিষয় নিয়ে কোনো সময় দুর্বলতায় পড়েন, কখনো নির্মম বস্তুবাদী হন। ইতালির লেখক আলবার্তো মোরাভিয়া 'ওম্যান অব রোমে' দেহদানের ব্যাপারটা প্যাথলজিকাল ট্রিটমেন্টে নিয়ে গিয়ে তাকে পর্নোগ্রাফির পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছেন, আবার সেই লেখক 'টু ওমেন' কাহিনীতে সৈন্যদের

দ্বারা মা ও মেয়ের ধর্ষণের যে বলিষ্ঠ চিত্র এঁকেছেন তা যথাযথ বাস্তবতায় উজ্জ্বল। আশাকরি ডি সিকার এই কাহিনীর নির্মম চিত্ররূপ যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই আমার বক্তব্যকে স্বীকার করবেন।

আমাদের লেখকদের এই ব্যাপারে চিরাচরিত সংস্কারের অনুবর্তী না হয়ে এই মিথ্যাকে ভাঙতে হবে। পুরুষ ও নারীর সম্মানজনক সম্পর্ককে নতুন সমাজব্যবস্থা নির্মাণের প্রয়োজনেই এই দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করতে হবে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি সাক্ষাৎকার

॥ ১ ॥

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : সাহিত্যের হাত পরিষ্কার রাখতে হবে। দালালি করে পাটের ব্যবসা করা যায়, লেখক হওয়া যায় না।

চুপ। চুপ। চুপ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন : আমি মানুষ হিসেবে সর্বদাই সর্বহারা শ্রেণীর পাশে। আরো দশজন খেটে-খাওয়া মানুষের মতন আমিও একজন লেখার মজুর। সাহিত্যিক বলে সমাজের কাছে আমার বিশেষ সুবিধে নেবার অধিকার নেই।

মানিকটা গোল্লায় গেল! কম্যুনিস্ট পার্টি ওকে শেষ করে দিল! কম্যুনিস্ট মানিকের লেখক-প্রতিভা নিঃশেষ!

অহো, পুতুল নাচের ইতিকথা। অহো, দিবারাত্রির কাব্য। অহো, চতুষ্কোণ।

ছোট বকুলপুরের যাত্রী? চিহ্ন? সোনার চেয়ে দামী? আজকাল পরশুর গল্প?

না না, প্রোপাগাণ্ডা। শিল্পরস খর্বিত।

সুতারকিন স্ট্রিট সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মাসি ভেবেছিলেন পাই-পাই করে আরো দশজনের মতন মানিকবাবু খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকে পড়বেন!

পাঠক বলুন, মানিকবাবু কী খিড়কির আশ্রয় নিয়েছিলেন॥

॥ ২ ॥

মানিক হেসে বললেন : লেখাটা যে-শ্রেণী-সংগ্রামের কত বড় হাতিয়ার আগে বুঝিনি। ওরা আমার নাকের সামনে দরজা বন্ধ করে দিয়ে স্বীকার করে নিল লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর যাই হোক ওদের রক্ষিতা নন্। আমি কাদের জন্য লিখছি, কাদের জন্যে সত্যিকার আমাকে লিখতে হবে, এই চিন্তাটা আমার কাছে সূর্যালোকের মতন স্পষ্ট হয়ে এল।

মানিকবাবু আপনার কী বিশেষ শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত আছে ?

মানিক হাসলেন : সমাজে যখন শ্রেণী রয়েছে তখন কোনো না কোনো শ্রেণীর প্রতি পক্ষপাত তো আমার থাকবেই ; ত্যাখো, আমার দেশের অধিক মানুষেরই যখন নিজের ঘর নেই, আহার নেই, অর্থ নেই, তখন আমি নিখে বাড়ি-গাড়ির স্বপ্ন দেখি কী করে ? সেটা তো আমার শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতার শামিল হবে।

কিন্তু আপনার পরিবার, ছেলেমেয়ে ?

তাদের দুমুঠো খেতে দিতে পারলেই আমি সন্তুষ্ট থাকব।

॥ ৩ ॥

মানিকবাবু আপনার লেখক হয়ে-ওঠার গল্প বলুন ?

বাজি ধরে লেখা অতসী মামীর গল্প তো অনেকবারই বলেছি।

বললাম : বাজি ধরে গল্প লেখা আমি বিশ্বাস করি না। ব্যাপারটার মধ্যে স্টাণ্ট আছে।

মানিক হা হা করে হাসলেন। ঠিকই বলেছ। লেখকের প্রকাশ হওয়াটা হঠাৎ হয়ে পড়ে কিন্তু তার প্রস্তুতি দীর্ঘকাল নিঃশব্দে চলে।

অমন রোম্যান্টিক গল্প আপনি কেন লিখলেন ?

কী জানি, বোধকরি আমার মধ্যে সেই তরুণ বয়েসে এ ধরনের একটা বোহিমিয়ানিজম কাজ করে থাকবে।

কলোল গোষ্ঠীর সঙ্গে আপনি কী একাত্মতা বোধ করেন ?

কেন ? একথা বলছ কেন ? বিচিত্রা গোষ্ঠী নয় কেন ?

প্রাগৈতিহাসিক গল্পে আপনি নিদারুন মর্বিড। অবিশ্যি বোহিমিয়ানিজম তখনো ছাড়েননি।

মানিক চিন্তিত হলেন। তারপর বললেন : কী জানি, মর্বিড শব্দটা তোমরা গালাগালির অর্থেই বলছ কিনা। ত্যাখো, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র, জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখবার কায়দাটা প্রথমাবধি আমার সাহিত্যে হাজির। একে আমার দৃষ্টিভঙ্গি, বড় করে বললে, আমার লেখক ব্যক্তিত্বও বলতে পারো।

আপনি কী কোনো দর্শনের কথা বলছেন ?

না, কেতাবী দর্শন আমার তেমন পড়া নেই। ডাক্তারদের রোগ ঘেঁটে ঘেঁটে যেমন অভিজ্ঞতা হয় আমার তেমনি জীবন সম্পর্কে একটা বোধ জন্মে গেছে।

তাই কী আপনার অনেক চরিত্র প্যাথলজিকাল স্টাডি হয়ে পড়েছে।

লেখবার আদিপর্বে এমনটি ঘটা অসম্ভব নয়। সম্ভবত আরো দশজনের মতন আমিও ভাবতাম মানুষের নির্জ্জান মনের কাণ্ডকারখানাটাই তার জীবনকে সুস্থ স্বাভাবিক হতে দিচ্ছে না। আমার আশা ছিল নির্জ্জান মনের জটিলতাকে যদি উদ্‌ঘাটন করে দিতে পারি তাহলে রোগ ধরা পড়লে যেমন সুচিকিৎসার ব্যবস্থা হয় তেমনি মানুষ একদিন স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারবে!

শেষ পর্যন্ত আপনি কী এই নির্জ্জান মনেরই প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন?

বোধহয় তাই। মার্কসবাদের জ্ঞান যেদিন আমার হাতের মুঠোয় এসে গেল সেদিন নতুন করে উপলব্ধি করলাম সবার উপরে অর্থনৈতিক অবস্থাটাই মানুষের সমূহ জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে।

জীবনকে দেখার এই মর্বিডিটি কী আপনার লেখকজীবনকে কিছু সাহায্য করেছে?

মানিক হাসলেন। ত্যাখো জন্মেই তো কেউ মার্কসবাদী হয় না, তাহলে তো মার্কসবাদই মিথ্যা হয়। আমার মেণ্টাল মেক-আপ-কে তো একেবারে উড়িয়ে দিতে পারি না! যেমন ডস্টয়ভসকি আর টলস্টয়. মনোভঙ্গির কারণেই উভয়ের রচনায় আকাশ-পাতাল তফাত। তা ত্যাখো রোমাণ্টিসিজমের ভূতটা (? ?)আমাকে তেমন কায়দা করতে পারেনি সেটা এক দিক থেকে বাঁচোয়া। মর্বিড বলো অথবা রিয়ালিস্টিকই বলো, তার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। সেটা এই: এক্ষেত্রে জীবনকে সম্পূর্ণরূপে দেখতে হয়। রোমাণ্টিকদের মতো চোখ বুজে কল্পনা করে নিলেই চলেনা। হ্যাঁ একথা ঠিক, আমার গোড়ার সাহিত্যে অসুস্থ মানুষ নিয়ে বাড়াবাড়ি আছে। কিন্তু একথাও তো অস্বীকার করতে পারি না চরিত্রগুলো যথার্থই অসুস্থ। সীমাবদ্ধ চিন্তার কারণেই আমার সেদিন বুঝতে বিলম্ব হয়েছিল বিরূপ সমাজ ব্যবস্থাই এর জন্যে দায়ি। রোগটা আমি ধরেছিলাম ঠিক, কিন্তু রোগের মূল উৎপত্তির ক্ষেত্রটা ধরতে পারিনি। আমি আবারও বলছি মানুষ জন্মগত মার্কসবাদের অধিকার নিয়ে জন্মায় না।

॥ ৪ ॥

লোকে বলে এই মার্কসবাদে বিশ্বাস আপনার শিল্পীসত্তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। এবিষয়ে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছা করে।

মানিক হেসে বললেন : তোমরা কী বলো ?

আজকে আপনার কথাই শুনব।

মানিক হেসে জবাব দিলেন : না। মার্কসবাদ তো একটা ডগ্‌মা নয়, বিশ্বকে দেখবার বিশেষ একটা কৌশল। লেখকের মার্কসীয় দর্শন আয়ত্ত থাকলে তার লেখায় কোনো যান্ত্রিকতা আসতে পারে না। এটা নির্ভর করে খাঁটি লেখক সত্তার ওপর। একটু অহংকারের মতো শোনাচ্ছে, যদিও আমি জানিনা কতদূর খাঁটি হতে পেরেছি, তবে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

পার্টির নির্দেশ কী কখনো আপনাকে মানতে হয়নি ?

পার্টি আমাকে নির্দেশ করবে কেন ? রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিফলন সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে স্বাভাবিক ভাবে আসবে। কোনো বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রেও রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই।

এটা নীতির কথা।

তুমি তো নীতিগত প্রশ্নই তুলছ, তাই না ?

ধরুন রাজনীতিগত একটা অ্যাকশন ভুল হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সংস্কৃতি ফ্রন্টের কর্মী হিসেবে আপনার কী কর্তব্য হবে ?

মানিক চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন : তুমি তেভাগা আন্দোলনের কথা বলছ ?

যদি বলিই ?

ছাখো আমি এইভাবে জিনিসটাকে ভাবি : জমির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে কৃষকেরা সশস্ত্র প্রতিরোধ করছেন। সেখানে লেখক হিসেবে নয় সচেতন মানুষ হিসেবেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি তাঁদের আন্দোলনের যুক্তিযুক্ততা। আমি বিনাবাধায় সে-সংগ্রামের কাহিনী লিখতে পারি। লিখেছি ছোট বকুলপুরের যাত্রী-তে, লিখেছি হারানের নাতজামাই শীর্ষক গল্পে। রাজনীতিগত প্রশ্নটা কতদূর সঠিক ছিল সেটা ভাবার থেকে কৃষকদের সংগ্রামী চরিত্র তুলে ধরাই আমার পক্ষে জরুরি ছিল। কারণ আমি বিশ্বাস করি কখনো কোনো আন্দোলন কোনো কারণে সার্থক না হলেও তার প্রেরণা মুছে যায় না। যতদূর মনে পড়ে গর্কির 'মাদার' ১৯০৫-এর বিপ্লবেরই ফসল।

গর্কির 'ব্লাডি সানডে'-র ওপর গল্পটি বিশ্বাসঘাতক আন্দোলনের ওপর রচিত হলেও ভবিষ্যতে তার ঐতিহাসিক প্রেরণা শেষ হয়ে যায়নি।

মানিক সিগারেট ধরালেন। কেন? যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-দাংগার ওপর অসংখ্য গল্প আমাদের মতো মার্কসবাদী লেখকেরাই লিখেছেন। নারানবাবু, সুশীল-বাবু, রমেশবাবু, নবেন্দুবাবু···

আমি এ ব্যাপারে তর্ক তুলছি না।

না-তর্ক করেও বলা যায় এঁরা মার্কসবাদী হওয়া সত্বেও পার্টির কাছ থেকে কোনো নির্দেশের প্রার্থী ছিলেন না।

হেসে বললাম: সে তো অমার্কসবাদী লেখকেরাও লিখেছেন।

মানিক বললেন: তাহলেই বুঝুন এই বিশেষ পর্বে আমরা মার্কসবাদী লেখকেরাই নেতৃত্ব দিয়েছি। সে সময়ে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে আমরাই প্রভাবশালী অংশ। একথা বলা ভুল হবে না যে অন্যেরা আমাদের প্রভাবেই এজাতীয় বিষয় নিয়ে লিখতে বাধ্য হন্। তারাশঙ্করের মতন অনেকেই সেদিন আমাদের কাছাকাছি এসেছিলেন, আসতে হয়েছিল তাঁদের।

বললাম: ওঁরা চলে গেছেন।

মানিক হাত নেড়ে বললেন: সে কথা থাক। সে সব ইতিহাস আমাদের সকলের জানা।

কথাটা হচ্ছিল—

বুঝেছি। লেখক যদি যথেষ্ট শক্তিশালী না হন তাহলে আদত দর্শন না বুঝে বারবার রাজনৈতিক ফতোয়াকে গল্পে রূপ দিতে চেষ্টা করে তিনি যান্ত্রিক হয়ে পড়েন। ফতোয়া যদি পরবর্তী কালে ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর গল্পও ব্যর্থ হয়। হয়েছে।

তাহলে?

তাহলে কী? সে তো হবেই। লেনিন তাঁর রাজনৈতিক কর্মীদের সাবধান করে দিয়েছেন যেন গর্কিকে সব সময় বিরক্ত করা না হয়। তার অর্থ কী? খুব পরিষ্কার। লেনিন জানতেন বিপ্লবী পার্টির ক্ষেত্রেও রাজ-নৈতিক কর্মী এবং সাহিত্যকর্মীর কাজের দুটো ভিন্ন চরিত্র আছে। পার্টির কাছে শস্তা হাততালি পাবার উৎসাহে লেখক যদি আন্তরিক সৃজনশীলতাকে বিসর্জন দিয়ে পার্টির তাৎক্ষণিক লাইন অনুযায়ী ফরমায়েশি গল্প লিখতে বসেন তাহলে পার্টির দোষ নয়, দোষ লেখকের। মার্কসীয় দর্শনে যদি আপনার

চৈতন্য অভিষিক্ত থাকে তাহলে আপনার কোনো রচনাই মার্কসবাদ তথা পার্টিবিরোধী হতে পারে না। অন্তত আমার জীবনে এমন দৃষ্টান্ত নেই।

হেসে বললাম: গান্ধীমহারাজকে উপলক্ষ করে আমাদের সুকান্তর কবিতা রচনার প্রেরণার মূলে কী পার্টিলাইন নয়?

মানিক বললেন: সুকান্ত বেঁচে থাকলে এর জবাব দিতেন। তবে আমি বিশ্বাস করি শ্রেণীসংগ্রামে বিশ্বাসী শিল্পী একজন শ্রেণী-সমন্বয়ে বিশ্বাসী মানুষের বন্দনা রচনা করবেন না। সুকান্ত বেঁচে থাকলে এবং মার্কসীয় দর্শনে তাঁর সার্থক উপলব্ধি ঘটলে সম্ভবত তিনি তাঁর ভুল সংশোধন করতেন। উপস্থিত আমরা সুকান্তর কাব্যে ভিন্নতর প্রেরণা খুঁজব। আশা করি আমরা তা পাবই।

আচ্ছা মানিকবাবু, সত্যি করে বলুন দেখি আপনার কোন ক্ষোভ নেই?

আছে। নিজের ওপরই আমার ভীষণ ক্ষোভ। কেন আমি খাঁটি হতে পারছিনা, কবে আমি সত্যিকার লেখক হব। আমি অনেককে বলেছি লেখক হতে চাইলে মনেপ্রাণে চাষা হয়ে যান। কিন্তু আমি কী তা হতে পেরেছি, মনে হয় না।

বুর্জোআ সমাজের ওপর আপনার ভয়ানক রাগ, তাই না?

সব সময় তো রাগতে পারি না। আমার লেখা বুঝেই হোক আর না বুঝেই হোক বুর্জোআ প্রকাশকরাই তো ছাপছেন।

তাহলে এঁদের বদান্যতা আপনি স্বীকার করেন?

ওঁরা ব্যবসাদার মানুষ। ওঁদের কাছে মানিকই বলুন আর হরিদাস পালই বলুন, একই দরের। হয়তো কিছু বই বিক্রিও হয়।

তাহলে দেখুন আপনি প্রকাশকের সমস্যায় কখনো পড়েন নি?

বুর্জোআ প্রেস তো ভুল করে আমার কিছু প্রচার আগেই করে ফেলেছে। তাছাড়া সংস্কৃতিফ্রণ্টে এখন আমাদের যে বৃহস্পতি-দশা চলেছে সে-ব্যাপারটাও প্রকাশকের কাছে কম আগ্রহের বস্তু নয়। আমার পিছনে তাবৎ প্রগতিশীল শক্তির দাপটটা তাঁরা লক্ষ্য করেছেন। চতুর প্রকাশক ব্যবসার খাতিরে এ-সুযোগকে উপেক্ষা করতে পারেন না।

তাহলে বলতে চান কোনো কারণে চাকা ঘুরে গেলে প্রকাশকেরা আপনাকে বিমুখ করতে পারেন।

করলে আশ্চর্য হব না।

আচ্ছা আপনি রয়্যাল্টি সময় মতন পেয়ে থাকেন ?

আদায় করতে হয়। এ-ব্যাপারে আমাকে বেশি ঘাঁটায় না ওরা। জানে তো আমি মোটেই ভদ্দরলোক নই। এই আধ ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি আর পায়ের চটি ছাড়া আমার বাড়তি পোশাক নেই। আমি যখন টাকা চাইতে আসি তখন ওরা দস্তুরমতন জানেন রেশন তুলতে হবে। সকলেই জানেন পেটের ক্ষুধা কোনোরকম ভদ্রতা রক্ষা করে চলে না। সেদিন টাকা চাইতে গিয়ে যেমন হল! প্রকাশক বললেন: ভাই, টাকাটা কালকে নিলে হয় না? একটা পেমেণ্ট করতে হবে। জ্যাখো আমার বড় মেয়েটা কদিন থেকে জ্বরে ভুগছে। ডাক্তার সন্দেহ করছেন টাইফয়েড। টাকার অভাবে আমি হন্যে হয়ে রয়েছি। প্রকাশকের উচ্চাঙ্গের রসিকতায় এমন কাঁচা খিস্তি শুরু করলাম যে টাকা দিয়ে আমাকে পত্রপাঠ বিদায় করে উনি স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লেন।

বললাম: সাহিত্যের অবস্থা তো এই। চেষ্টা করলে কী আপনি একটা ভালো চাকরি পাননা? আপনার আত্মীয়স্বজন তো···

মানিক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ওরা দস্তুরমতন বড়লোক। এমন বড়লোক যে আমার বৃদ্ধ বাবা আমার মতন গরিব ছেলের কাছেই থাকতে ভালোবাসেন। কি বলছিলে বাঁধা চাকরি? তা কী চেষ্টা করে দেখিনি? তাহলে চাকরি করাই হয় লেখা হয় না। আমি যেদিন থেকে বুঝেছি লেখা ছাড়া আমার দ্বিতীয় কাজ নেই সেদিন থেকে লেখাকেই আঁকড়ে ধরেছি। লেনিন প্রফে-শনাল রেভলিউশনারির কথা বলেছেন, আমিও প্রফেশনাল লেখক হতে চাই। পার্টটাইমার নয়, হোল্‌টাইমার লেখক।

হেসে বললাম: আপনি লেখেন কখন? বাজার-রেশন থেকে যাবতীয় কাজ তো আপনাকেই করতে দেখি। তারপর সভাসমিতি আছে, প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ আছে···

মানিক বললেন, যে কাজ করতে চায় তার সময়ের অভাব হয় না। বাজার রেশন সবরকমের কাজেই আমার আগ্রহ আছে। এবং সব ধরনের কাজেই আদি ও অকৃত্রিম লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিরাজমান। বাজারে মেছুনী কী শবজিঅলা, তাদের মুখ, হাবভাব, চরিত্র আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখি, রেশনের মালিকও আমার দৃষ্টি থেকে এড়ায় না। এরা সকলেই আমার লেখক অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে রয়েছে। গল্পে যখন শবজিঅলার চরিত্র আঁকি

তখন আমাকে কষ্টকল্পনা করতে হয় না, চেনা লোককেই সহজে এনে হাজির করি। লেখকেরা তো পদ্মভুক নন, নিতান্ত সাধারণ একজন সামাজিক জীব, তাকে বাজার করতে হয়, রেশন তুলতে হয়। আরো দশজন মানুষ যেমন করে আর কী।

আপনি কী প্রগতি লেখক-আন্দোলন সম্পর্কে আশাবাদী?

একশোবার। আজ পর্যন্ত বিশ্বে মার্কসবাদই একমাত্র প্রগতিশীল দর্শন।

আপনি কী মনে করেন যথার্থ সাহিত্যিকের পক্ষে মার্কসবাদ অবশ্যই গ্রহণীয়?

হ্যাঁ তাই। এই বিশেষ জ্ঞান সমাজের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মানুষের সঙ্গে উৎপাদন শক্তির সম্পর্ক, সামাজিক দ্বন্দ্ব, যাবতীয় জটিলতা বোঝবার চাবিকাঠি। চাবি যাঁর হাতে নেই তিনি অন্ধের মতো পথ হাতড়াবেন, লক্ষ্য খুঁজে পাবেন না। অবশেষে অজ্ঞানতার জালে আটকে পড়ে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন। অমার্কসবাদী লেখকদের অবস্থা তো দেখাই আছে, ভাঙা সমাজব্যবস্থাকে রক্ষার জন্যে অপটু মিস্ত্রির মতো এখানে চুনকাম করছেন, ওখানে পলেস্তারা, শেষ পর্যন্ত হুড়মুড় করে মাথার ছাদটা ধসে পড়ছে। ভাঙা সমাজটাকে নিয়ে মড়াকান্না আর কতদিন চলতে পারে? এর প্রয়োজন শেষ হয়েছে, যত তাড়াতাড়ি এর গঙ্গাযাত্রা হয় ততই মঙ্গল। হ্যাঁ আমরা প্রগতিশীল লেখকেরা ভাঙা ব্যবস্থাকে ভিতশুদ্ধ ভাঙতে চাই, কারণ নতুন সমাজব্যবস্থার জন্যে মানুষের চিন্তাকে প্রশস্ত করতে হবে। এই আশাতেই বেঁচে আছি, এই আশাতেই আজীবন কলম চালিয়ে যেতে হবে। তোমরা কী বলো?

এই গ্রন্থ ভালো লাগলে পড়ুন
এই লেখকেরই

দ্বিরাগমন
জীবন নিরবধি
পৃথিবীর বয়স
ধূসর পদাতিক
নির্বাচিত গল্প
তোমার আমার সকলের জন্য
পশ্চিম বাঙলার গল্প সংগ্রহ
পরশুরামের কুঠার
শতবর্ষের আলোকে শরৎচন্দ্র